সর্বসাধনার সারকথা

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

সর্বসাধনার সারকথা

জীবমাত্রেরই স্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময় সত্তা। এই সত্তা সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ তথা আনন্দ-স্বরূপ। সর্বাবস্থাতেই এই নিত্য সত্তা নির্বিকার, অসঙ্গ। মানুষ যখন তার স্বরূপকে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে ভুলে থাকে, তখনই তার চেতনায় দেহাভিমান সৃষ্ট হয় এবং সে আপনবোধে শরীরকেই আত্মা বলে মনে করে। শরীরকেন্দ্রিক এই আত্মভাবনা তিন প্রকারে ঘটে। প্রথম হল 'আমি শরীর', দ্বিতীয়টি 'আমার শরীর' এবং তৃতীয়টি হল 'আমার জন্য শরীর'।

জগতে আমাদের গোচরে প্রধানত দুটি বিষয়ের প্রকাশ ঘটে,—নশ্বর (জড়) আর অবিনশ্বর (চিৎ)। এই ভাগ দুটি পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর। এই বিভাজনই গীতায় উক্ত হয়েছে শরীর ও শরীরী, ক্ষর ও অক্ষর, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আদি নামের মাধ্যমে। এই বিভাজনকেই সাধুসন্তগণ 'নাস্তিত্ব' ও 'অস্তিত্ব' বাচক নামে পরিচায়িত করেছেন। আমার স্বরূপই হল 'শরীরী' যা চিৎ, অবিনাশী, অক্ষর এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রকৃত অস্তিত্ব। যা আমার স্বরূপ নয়, সেই বিভাগের অন্তর্গত হল 'শরীর', তথা যা কিছু জড়, বিনাশী, ক্ষর ও ক্ষেত্র অর্থাৎ নাস্তিত্ববাচক সব কিছু। যা 'অস্তি' রূপে আছে তা নিত্য

বিদ্যমান, অপর পক্ষে যা 'নাস্তি' রূপে প্রকাশিত তা একদিকে যেমন প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্য দিকে তেমন হারাতেও হয়।

একটি প্রণিধানযোগ্য কথা হল এই যে, 'নিত্য' অস্তিত্বকে আপাতভাবে শুদ্ধ অস্তিত্ব বলে চেনা যায় না, কিন্তু অনিত্যকে অনিত্যরূপে ঠিক ঠিক বুঝলে নিত্য অস্তিত্বকে বুঝতে পারা যায়। এই ভ্রান্তির কারণ হল, আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা আছি—এইভাবে অস্তিত্ব নিয়ে বিচার করতে হলে আমি যদি মন-বুদ্ধিকে ব্যবহার করি, চিত্তবৃত্তিকে ব্যবহার করি তাহলে তো 'নিত্য অস্তিত্বের' বোধের সাথে অনিত্যও (মন-বুদ্ধি, বৃত্তি, অহং-ভাব) মিশে থাকবে। কিন্তু 'আমি শরীর নয়', 'শরীর আমার নয়' এবং 'শরীর আমার জন্য নয়'—এই রকমভাবে যা নেই তাকে নেতিবাচক বিচার করলে ঐ চিত্তবৃত্তিও নাস্তিত্ব বাচক হয়ে যাবে এবং শুদ্ধ অস্তিত্বমাত্রই শেষ পর্যন্ত রয়ে যাবে। উদাহরণরূপে বলা যায়, ঝাড়ু দিয়ে গৃহের ধুলো-ময়লা দূর করার পর ঝাড়ুটিও পরিত্যক্ত হয়ে যায়, কিন্তু পরিচ্ছন্ন গৃহটি শেষ অবধিই থেকে যায়। অর্থাৎ 'আমি আত্মা', এই কথা মনের দ্বারা চিন্তা ও বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করার পরও চিত্তবৃত্তির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ থেকেই যাবে, কিন্তু 'আমি শরীর নয়'—এইভাবে বিচার করলে শরীর ও চিত্তবৃত্তির মধ্যে সম্বন্ধের ভাব ছিন্ন হয়ে যাবে এবং চিন্ময় সত্তারূপে শুদ্ধ স্বরূপ স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে পড়বে। এইজন্যই তত্ত্ব উপলব্ধির লক্ষ্যে নিষেধাত্মক বা নেতিবাচক বিচারের সাধনই মুখ্য। এই প্রকার সাধনায় সাধকের পক্ষে তিনটি কথা স্বীকার করে নেওয়া অতি আবশ্যক। সেগুলি হল, 'আমি শরীর নয়', 'শরীর আমার নয়' এবং 'শরীর আমার জন্য নয়'। যতকাল সাধকের এই ভাব থাকবে যে, 'আমি শরীর', 'আমার শরীর' তথা 'আমার জন্য শরীর' ততকাল সে যতই শাস্ত্রকথা ও উপদেশ নিয়ে পড়াশুনা করুক বা অন্যকে শোনাক, তার 'শান্তি'বোধ হবে না এবং 'কল্যাণ'প্রাপ্তিও ঘটবে না। এইজন্যই গীতার শুরুতেই ভগবান সাধকের প্রয়োজনে এই কথায় বিশেষ জোর দিয়েছেন যে, যা পরিবর্তনশীল, যার জন্ম-মৃত্যু আছে, সেই শরীরটি আসলে তুমি নও।

আমি শরীর নই

সর্বপ্রথম সাধককে এই কথা বিশেষভাবে বুঝে নিতে হবে যে, 'আমি' স্বরূপত চিন্ময় সত্তা, আমি শরীর নয়। আমরা বলি যে, ছোটবেলায় যে আমি ছিলাম, আজও সেই আছি। শরীরগতভাবে শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত আমার শরীরে এতই পরিবর্তন হয়েছে যে তা এখন চেনা পর্যন্ত সম্ভব হয় না, অথচ আমরা 'সেই একই আছি' বলে নিজেদের অনুভব করে থাকি। শৈশবে আমি খেলাধুলো করতাম, তার পরের পর্যায়ে শুরু হল আমার পড়াশুনা, আজ আমি জীবিকার্জনের জন্য চেষ্টিত। সব বদলে গেছে, কিন্তু আমি সেই একই আছি। অথচ এই শরীর ক্ষণকালের জন্যও একরকম থাকে না, নিরন্তর তার মধ্যে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, যা পরিবর্তনশীল তা কখনো আমার স্বরূপ হতে পারে না। যা নিত্য অপরিবর্তনীয়, তাই হল আমার স্বরূপ। আমি এখন পর্যন্ত অসংখ্য শরীর ধারণ করেছি, কিন্তু সব শরীর ত্যাগ হয়ে গেলেও, আমি একই থেকে গেছি। মৃত্যুর সময় তো এখানেই শরীর থেকে যাবে, কিন্তু আমি অন্য গর্ভে প্রবিষ্ট হবো, স্বর্গ-নরকাদি লোকে আমি যাবো, আমার একসময় মুক্তিও হবে, আমি ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করবো। অর্থাৎ আমার স্ব-অস্তিত্ব শরীরের অধীনে নয়। শরীরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে দুর্বলতা বা সবলতায়, বাল্যে বা বৃদ্ধাবস্থায়, কিংবা থাকা-না থাকায় আমার সত্তার কিছু যায়-আসে না। যেমন, আমি কোনো গৃহে বাস করা মানে তো আমার সেই গৃহের মতো আকৃতি হয়ে যাওয়া নয়। গৃহ আলাদা, আমি আলাদা, গৃহ যেখানে ছিল সেখানেই থাকে, আমি সেটি ছেড়েও চলে যেতে পারি। তেমনই দেহ বা শরীর এখানেই থেকে যায়, আমরা দেহত্যাগ করে চলে যাই। শরীর তো মাটির সঙ্গে মিশে যায়, কিন্তু আমি তা হই না। আমাদের স্বরূপ সম্পর্কে গীতায় বলা হয়েছে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
(গীতা ২।২৩-২৩)

'অস্ত্র এই শরীরীকে কাটতে পারে না, অগ্নি একে জ্বালাতে পারে না, জল একে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু একে শুকিয়ে দিতে পারে না। এই সত্তাকে কাটা যায় না, জ্বালানো যায় না, আর্দ্র করা যায় না, শুকোনোও যায় না। কারণ এটি নিত্য-অস্তিত্ব, সর্বত্র পরিপূর্ণ, অচল, স্থির স্বভাবসম্পন্ন তথা অনাদি।'

অর্থাৎ শরীরের ক্ষেত্রটাই পৃথক কিন্তু অপরিবর্তনীয় শরীরী অর্থাৎ স্বরূপের ক্ষেত্রটা একেবারে অন্য। আমাদের স্বরূপ কোনোভাবেই শরীরের সঙ্গে লিপ্ত নয়। এইজন্য ভগবান গীতায় স্বরূপকে সর্বব্যাপী বলে অভিহিত করেছেন—**'যেন সর্বমিদং ততম্'** (২।১৭), **'সর্বগতঃ'** (২।২৪) অর্থাৎ স্বরূপ জীবের শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, প্রকৃতপক্ষে তা সর্বব্যাপী।

শরীর সৃষ্ট হয় পৃথিবীতেই (মাতৃগর্ভে), এইখানেই তা চলাফেরা করে এবং মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতেই তার লয় হয়ে যায়। এই শরীরের তিনটি অন্তিমদশা দেখা যায়। হয় এটি চিতায় ভস্মীভূত হবে, কিংবা এটিকে মাটির তলায় কবর দেওয়া হবে, অথবা জন্তু-জানোয়ারের খাদ্যরূপে পরিশেষে তা বিষ্ঠায় পরিণত হবে। তাই শরীরকে মুখ্য বলে ধরা যায় না, বস্তুত আমাদের স্বরূপই মুখ্য সত্তা।

যদিও প্রকৃত অস্তিত্ব আত্মসত্তারই, শরীরের নয় ; তথাপি সাধকের এই ভুলটা হয়েই থাকে যে, সে আগে শরীরকে দেখে তবে আত্মার অবস্থিতি বোঝে, আগে আকৃতিকে দেখে তারপর ভাবকে বুঝতে পারে। চাকচিক্যের জন্য কোনো জিনিসের ওপরে যে পালিস করা হয় তা কতটুকু সময়ের জন্য স্থায়ী হয় ? সাধকের বিচার করা উচিত, আত্মা না দেহ, কোন্‌টি আগের প্রকাশ। বিচারের দ্বারা এইটাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মাই আগের, শরীর পরে সৃষ্ট হয়েছে। ভাব আগে, আকৃতি পরে। এইজন্য

আমাদের দৃষ্টি আগে ভাবরূপ আত্মস্বরূপের প্রতি চালিত হওয়া উচিত, শরীরের প্রতি নয়।

ভোজনালয় যেমন ভোজন করার স্থান, তেমনই এই শরীর হল সুখ-দুঃখ ভোগ করার স্থান (ভোগায়তন)। আসলে শরীর সুখ-দুঃখ ভোগ করে না, শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধীভূত 'আমি'ই ভোক্তা। ভোগ করার স্থান আর ভোগকারী বা ভোক্তা একেবারেই পৃথক। বস্তুত শরীর তো ওপরের খোলসমাত্র। আমি যে রকম বস্ত্রই পরি না কেন, সেটি পৃথকই থাকে, আমার শরীরের সঙ্গে এক হয়ে যায় না। যেমন অনেকবার বস্ত্র পরিবর্তন করলেও আমি একই থাকি, অনেক হয়ে যাই না, তেমনই অনেক প্রজাতিতে জন্মান্তরে অনেক শরীর ধারণ করলেও আমি স্বয়ং স্বরূপত একই (পূর্ববৎ) থেকে যাই। যেমন পুরোনো বস্ত্র পরিত্যাগ করলেও আমি মরি না, আর নতুন বস্ত্র পরিধান করলে আমি নবজন্ম লাভ করি না, তেমনই পুরোনো শরীর ত্যাগ করলে আমি মরি না এবং নতুন শরীর ধারণ করায় আমি জন্মাই না[১]। অর্থাৎ শরীরেরই জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, আমার জন্ম-মৃত্যু নেই। আমিই যদি মরে যাই তো আমার কর্মফলের পাপ-পুণ্য কে ভোগ করবে ? অন্য প্রজাতিতে তথা স্বর্গ-নরকে কে যাবে ? কার বন্ধন হবে ? মুক্তই বা কে হবে ? আমার জীবন এই শরীরের অধীনে নয়। আমার আয়ুর দৈর্ঘ্যের শেষ নেই, তা অনাদি অনন্ত। মহাসর্গ তথা মহাপ্রলয় হলেও আমার জন্ম-মৃত্যু হয় না, বাস্তবিকই আমি অপরিবর্তনীয় স্বরূপ, যেমন তেমনই বর্তমান থাকি—**'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** (গীতা ১৪।২)।

আমার এবং এই শরীরের স্বভাব সম্পূর্ণ পৃথক। আমি শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট আছি মাত্র, কিন্তু শরীরের সঙ্গে মিলে যাইনি। শরীরও আমার সঙ্গে এক হয়ে নেই। শরীর যেমন সংসারে থাকে, আমি কিন্তু শরীরে

[১]বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
(গীতা ২।২২)

তেমনভাবে নেই। শরীরের সঙ্গে আমার কখনো মিলনই হয়নি, হয় না, হবে না, হতেও পারে না। বস্তুত আমার জন্য শরীরের কোনো প্রয়োজনই নেই। শরীর ব্যতিরেকেই আমি স্বয়ং আনন্দে থাকি। অর্থাৎ শরীর না থাকলেও আমার কিছুই ক্ষতি হয় না। এখন পর্যন্ত আমি অসংখ্য শরীর ধারণ ও ত্যাগ করে এসেছি, কিন্তু তার ফলে আমার স্বরূপ-সত্তায় তফাতটা কী হয়েছে ? আমার কী লোকসান হয়েছে ? আমি তো যেমন ছিলাম তেমনই রয়ে গেছি—**'ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে'** (গীতা ৮।১৯)।

শরীর, ইন্দ্রিয়গুলি, মন, বুদ্ধি ও অহংকার কেন্দ্রিক অভাবের অনুভব তো সকল জীবই করে থাকে, কিন্তু নিজের সত্তার অভাবের অনুভব কারও কখনও হয় না। উদাহরণরূপে বলা যায়, সুষুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা) কালে আমরা শরীরের 'অভাব' বোধে থাকি। কেউ কিন্তু এই কথা বলে না যে, সুষুপ্তির সময় আমি ছিলাম না, আমার তখন মৃত্যু হয়েছিল। কারণ শরীরাদির অভাববোধে থাকা সত্ত্বেও আমার অনুভবে কিন্তু 'আমি'বোধের অভাব ছিল না। সেইজন্যই ঐ নিদ্রাভঙ্গের পর আমি বলি, এমন মহাসুখে আমি শুয়েছিলাম যে অন্য কোনো কিছু অনুভবই করিনি। সুষুপ্তিতেও আমার আত্মসত্তা কিন্তু সেই অবিকারী এক ভাবেই বর্তমান ছিল। এর দ্বারা এই সিদ্ধ হয় যে, আমার অস্তিত্ব শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের অধীনে থাকে না। স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর এই সবেরই অভাববোধ আমার সম্ভব হতে পারে কিন্তু আমার আত্মচৈতন্যের অভাব কখনোই সম্ভব নয়।

আমার স্বরূপ স্বতই স্বাভাবিকভাবে অসঙ্গ—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৫), **'দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ'** (গীতা ১৩।২২)। এইজন্য শরীরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ মেনে নিলেও বস্তুত আমি শরীরে লিপ্ত হই না। শরীরের সঙ্গ করলেও প্রকৃতপক্ষে আমি (স্বরূপত) অসঙ্গই থাকি। সেইজন্যই ভগবান বলেছেন—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায়ও স্বরূপ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

মুক্তই থাকে। বদ্ধতাকে আমরা জাগতিক ভাবে মেনে নিলেও আমাদের স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই মুক্ত থাকে। যেমন অন্ধকার আর আলোর প্রকাশে কোন আপস-মিলন সম্ভব নয়, তেমনই (বিনাশী, জড়) শরীর আর (অবিনাশী, চিৎ) স্বরূপ কখনোই মিলতে পারে না। কারণ এই শরীর জগৎ-সংসারের অংশ, আর আমি স্বয়ং পরমাত্মার অংশ।

একই দোষ বা গুণ স্থানভেদে অনেকভাবে প্রকট হয়। শরীরকে স্বরূপের থেকেও বেশি মর্যাদা দেওয়া অর্থাৎ প্রকারান্তরে শরীরকেই আত্মস্বরূপ বলে মনে করাই আমাদের মূল ত্রুটি, যা থেকে বাকি সকল দোষ বা ভ্রান্তির উৎপত্তি সম্ভব হয়। নিজের স্বরূপ, যা চিন্ময় সত্তামাত্র, তাকে শরীরের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়াই মূল গুণ, যার থেকে সকল সদ্‌গুণের উৎপত্তি ঘটে।

গীতার প্রারম্ভেই অর্জুন ভগবানকে নিজের কল্যাণের উপায় কী তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, '**যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে**' (২।৭)। এর উত্তরে ভগবান প্রথমে শরীর ও শরীরীরই (স্বরূপ) বর্ণনা করেছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, যে মানুষ নিজের প্রকৃত কল্যাণ চায় তার প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, 'আমি শরীর নই'। যতকাল তার 'আমি শরীর', এইভাব থাকবে ততকাল সে যতই উপদেশ শুনুক অথবা শোনাক আর সাধনার অভ্যাস করুক, তার প্রকৃত কল্যাণ হবে না।

মানবদেহে চিত্তগত প্রকাশে প্রধান হল বিবেক। তাই 'আমি শরীর নই'—এই বিবেকবোধ একমাত্র মানব শরীরেই প্রকাশিত হতে পারে। শরীরকেই 'আমি' বলে মনে করা কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়, বস্তুত তা পশুত্বের পর্যায়ে পড়ে। এইজন্য শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন—

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবত্ত্বং নঙ্‌ক্ষ্যসি॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৫।২)

"হে রাজন্! এখন তুমি, 'আমি মরে যাব' ভাবনারূপ পশুত্ববোধ

ছেড়ে দাও। শরীর যেমন আদিতে ছিল না, পরে তার জন্ম হয়েছে এবং তার মৃত্যুও হবে, তেমনই তুমি যে আগে ছিলে না, পরে জন্মেছ এবং মরে যাবে— এমন কোন কথা বলা যেতে পারে না।''

শরীর কখনোই একরূপে থাকে না আর আমাদের স্বরূপ কখনোই বিভিন্ন রূপ পেতে পারে না। জন্মের আগেও শরীর ছিল না, মৃত্যুর পরেও তা থাকবে না, আবার বর্তমানেও প্রতিক্ষণে তা মরছে। বস্তুত গর্ভে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের মরণের ক্রমও শুরু হয়ে যায়। বাল্যাবস্থার দশাগত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যুবাবস্থার প্রকাশ ঘটে। যুবাবস্থার বিলয়ের মাধ্যমে আসে বৃদ্ধাবস্থা। আবার এই বৃদ্ধাবস্থার মৃত্যু হলে দেহান্তর দশা অর্থাৎ নতুন শরীরের প্রাপ্তি ঘটে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

(গীতা ২।১৩)

বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য—এই তিন দশা স্থূলশরীরেই হয়, আর দেহান্তর প্রাপ্তি হয় সূক্ষ্ম ও কারণশরীরের। দেহান্তর প্রাপ্তি (মৃত্যু) হলে স্থূলশরীরের ত্যাগ হয়ে গেলেও সূক্ষ্ম ও কারণশরীরের তা হয় না। যতকাল মুক্তি না হয়, সূক্ষ্ম ও কারণশরীরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধও ততকাল থেকে যায়। অর্থাৎ, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হল স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীর তথা এগুলির দশার অতীত সত্তা। শরীর ও তার দশার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আত্মস্বরূপ নিত্য একরূপ। জন্ম ও মৃত্যু আত্মার (সত্তার) ধর্ম নয়, তা শরীরেরই ধর্ম। আত্মার আয়ু অনাদি-অনন্ত, যার অন্তর্বর্তীকালে অসংখ্য শরীরের জন্ম ও মৃত্যু হয়ে চলেছে। আত্মস্বরূপের অর্থাৎ 'স্বয়ং'-এর স্বাতন্ত্র্য ও অসঙ্গত্ব স্বতঃসিদ্ধ। অসঙ্গ (নির্লিপ্ত) হওয়ার ফলে আমি অনেক শরীর ধারণ করলেও স্বরূপত একই রকম থাকি, যদিও শরীরের সঙ্গকে দেহাত্মবোধে ধারণা করায় আমাকে একের পর এক বহু সংখ্যক শরীর ধারণ করতে হচ্ছে। আমরা বুঝি যে কোনো সঙ্গই স্থায়ী নয়, তবুও এইভাবে আমরা পরপর নতুন দেহধারণ করে চলেছি। যদি এইরকম নতুন

সঙ্গ আর না করতে হয় তাহলে স্বতঃসিদ্ধভাবেই মুক্তি ঘটবে।

বালির মৃত্যুর পর তার স্ত্রী তারাকে শ্রীরাম বলেছিলেন—

তারা বিকল দেখি রঘুরায়া। দীন্হ গ্যান হরি লীন্হী মায়া॥
ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা॥
প্রগট সো তনু তব আঁগে সোবা। জীব নিত্য কেহি লগি তুম্হ রোবা॥
উপজা গ্যান চরন তব লাগী। লীন্হেসি পরম ভগতি বর মাগী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১১।২-৩)

স্থান বদলায়, কাল বদলায়, বস্তুসমূহ বদলে যায়, ব্যক্তি বদলে যায়, অবস্থা বদলে যায়, পরিস্থিতি বদলে যায়, ঘটনাসমূহ বদলে যায়, কিন্তু প্রকৃত 'আমি' বা আত্মস্বরূপ বদলায় না। আমি নিরন্তর একই থাকি। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন দশাই পাল্টে যায়, কিন্তু তিন অবস্থার মাঝে আমি একই থাকি। সেইজন্যই এই তিন অবস্থা ও তাদের পরিবর্তনকে (শুরু ও শেষ) বোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। স্থূলদৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হবে ব্যাপারটা যেন আমার হরিদ্বার থেকে রায়বালায় যাওয়া আবার রায়বালা থেকে হৃষীকেশ আসা। যদি হরিদ্বার বা রায়বালায় কিংবা হৃষীকেশে আমি স্থায়ী বাসিন্দাই হই তবে হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশে কি করে আসবো ? সুতরাং আমি হরিদ্বারের বাসিন্দা যেমন নয়, রায়বালা বা হৃষীকেশেরও নয়, অর্থাৎ এই তিন স্থান থেকেই পৃথক সত্তা। হরিদ্বার, রায়বালা ও হৃষীকেশ তো পৃথক পৃথক স্থান, কিন্তু আমি এই তিন স্থানকেই জানতে পারা একক সত্তা। এইরকমই আমি সর্বাবস্থাতেই একই থাকি। এই কারণে আমার পরিবর্তনশীল প্রকাশগুলির দিকে নজর না করে স্থায়ী সত্তার (স্বরূপ) দিকে লক্ষ্য করা উচিত—

রহতা রূপ সহী কর রাখো বহতা সঙ্গ ন বহীজে।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীর যেমন আমার নিজের নয়, ঠিক তেমনই স্থূলশরীর মাধ্যমে হওয়া ক্রিয়া, সূক্ষ্মশরীর মাধ্যমে হওয়া চিন্তন এবং কারণশরীর মাধ্যমে হওয়া স্থিরতা তথা সমাধি পর্যন্ত আমার নয়। কারণ এর প্রত্যেকটি ব্যাপারেরই শুরু ও শেষ আছে। প্রতিটি চিন্তা যেমন

আসে তেমন চলেও যায়। স্থিরতার পর আবার চাঞ্চল্য আসে, সমাধির পর আসে ব্যুত্থান। ক্রিয়া, চিন্তন, স্থিরতা ও সমাধি এর কোনোটির দশাই স্থায়ী হয় না। এইগুলির আসা-যাওয়ার অনুভব তো সবারই হয়, কিন্তু নিজের আত্ম-অস্তিত্বের আসা-যাওয়া বা কোনো পরিবর্তনের অনুভব কখনোই কারোর হতে পারে না। বস্তুত আত্ম-অস্তিত্বের বোধ চিরস্থায়ী।

আমাদের এটা বিবেচ্য যে, চুরাশী লক্ষ প্রজাতিতে একের পর এক শরীরে আমি জন্মানো সত্ত্বেও কোনো শরীরই আমার সঙ্গে থাকেনি, তাহলে এই শরীরটা আমার সঙ্গে কী করে থাকবে ? যখন চুরাশী লক্ষ শরীর আমি বা আমার নয় তাহলে আমার বর্তমান শরীরই বা আমার হবে কী করে, তা হতে পারে না।

শরীর আমার নয়

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বস্তুও আছে অনন্ত, কিন্তু তার কিঞ্চিন্মাত্রও যখন আমার নয়, তাহলে শরীরটাকে আমি নিজের বলে দাবি করি কী করে ? যে বস্তু পাওয়া গেলেও আবার তাকে হারাতেও হয় তা বস্তুত আমার নয়, এটি একটি সিদ্ধান্ত। আমি যে শরীরপ্রাপ্ত হই, একসময় তো তার ত্যাগও হয়ে যায়, সুতরাং তা তো অবশ্যই আমার নয়। প্রকৃতই নিজের হতে পারে তা-ই যা সর্বদা আমার সঙ্গে যেমন থাকবে, তেমন আমিও তার সঙ্গে সব সময় থাকবো। যদি শরীরটা আমারই নিজের হত তাহলে তো সেটি সর্বদাই আমার সঙ্গে একভাবে থাকতো এবং আমিও তার সঙ্গে থাকতাম। কিন্তু (পরিবর্তনশীল) এই শরীর এক ক্ষণের জন্যও আমার সঙ্গে থাকে না আর আমিও তার সঙ্গে থাকি না।

কোনো বস্তু সত্যিই নিজের হয় আর কোনো বস্তুকে নিজের বলে মেনে নেওয়া হয়। ভগবান আমার আপন সত্তা, কারণ আমি তাঁরই অংশ— **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। তিনি কখনোই আমাকে ছেড়ে যান না। কিন্তু শরীরটা আমার নয়, তাকে আমার বলে মনে করি মাত্র। যেমন কোনো নাটকে কেউ রাজা সাজে, কেউ সাজে রাণী, কেউবা সিপাই

সাজে, কিন্তু সবাইকেই নাটকটির প্রয়োজনে সাজানো, আসলে কেউই ঐ পরিচয়ের নয়। ঠিক সেইরকমই এই শরীর সংসারের ব্যবহারের (কর্তব্যপালন) জন্য নিজের বলে মনে করা। প্রকৃতপক্ষে তা নিজের নয়। যা বস্তুতই আমার আপন, সেই পরমাত্মাকেই আমি ভুলে আছি, আর যা আমার আপন নয়, সেই শরীরকে আমি নিজের বলে মেনে নিয়েছি—এ আমার মস্ত বড় এক ভ্রান্তি। শরীর স্থূল বা সূক্ষ্ম কিংবা কারণ এর যেটাই হোক না কেন এ সবই প্রকৃতিজাত। এগুলিকে নিজের বলে মনে করার ফলেই তো আমরা সংসারের বন্ধনে আটকে আছি।

পরমাত্মার অংশ হওয়ায় আমরা পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন। প্রকৃতির অংশ হওয়ায় শরীরও প্রকৃতির সাথে অভিন্ন। যা আমার সঙ্গে অভিন্ন তাকে আমার থেকে পৃথক মনে করা আর যা আমার থেকে পৃথক তাকে আপন মনে করাই সকল দোষের মূল। যা নিজের নয় তাকে আপন বলে মনে করার ফলেই যা বাস্তবিকই আপন, তাকে আপন বলে বুঝতে পারা সম্ভব হয় না।

এটা আমাদের সকলেরই অনুভবে ধরা পড়ে যে, প্রকৃতপক্ষে শরীরের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ (অধিকার) নেই। আমরা আমাদের ইচ্ছামতো শরীরকে বদলাতে পারি না, বৃদ্ধাবস্থা থেকে যুবাবস্থায় ফিরতে পারি না, রোগ হলেই নীরোগ হয়ে যেতে পারি না, দুর্বল দশাকে খুশিমতো সবল বানাতে পারি না, কুরূপকে সুরূপ করে দিতে পারি না, মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যান করে অমর হতে পারি না। যতই যত্ন করি না কেন অবাঞ্ছিত হলেও আমাদের শরীরে রোগ আসেই, তা দুর্বল হয়ে যায়, জরাগ্রস্ত হয় এবং এক সময় মৃতও হয়। তাহলে যেটার ওপর আমার কোনো বশই (জোর) নেই সেটাকে নিজের বলে মনে করা তো মূর্খতা।

শরীর আমার জন্য নয়

শরীর বিনাশশীল, কিন্তু আমাদের স্বরূপ অবিনশ্বর। অবিনাশী তত্ত্বের

নিজের বস্তুও তো অবিনাশীই হবে। কোনো বিনাশশীল বস্তু অবিনাশীর আপন কী করে হবে ? তা অবিনাশীর কি কাজেই বা লাগবে ? অমাবস্যার রাত্রি সূর্যের কোন্ কাজে আসবে ? জাগতিক শরীরাদি বস্তুর দ্বারা সংসারের প্রয়োজনই মিটতে পারে, আমার স্বরূপের কিঞ্চিৎমাত্র প্রয়োজনও তার দ্বারা সাধিত হতে পারে না। এইজন্যই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো বস্তু হতেই পারে না যা আমার বা আমার জন্য। তাই 'শরীর আমার' বা 'শরীরের দ্বারা আমার কোনো লাভ হবে'—এই ধারণা একেবারেই মিথ্যা। কর্ম-সাধনের জন্যই শরীর এবং কর্ম তো সম্পাদিত হয় কেবল সংসারের প্রয়োজনেই। যেমন কোনো লেখক যখন লিখতে বসেন, তখন তিনি হাতে লেখনী গ্রহণ করেন, লেখা শেষ হলেই তিনি লেখনীও হাত থেকে রেখে দেন। সেইরকমই আমাদের কর্ম সম্পাদনের জন্যই শরীরের প্রয়োজন, কর্ম শেষ হলে শরীরে নির্লিপ্ত হওয়া কর্তব্য। আমাকে যদি আর কোনো কর্ম না করতে হয় তাহলে আর আমার শরীরের কী প্রয়োজন ? যদি আমি আর কিছুই না করি তো শরীরের উপযোগিতাই আর থাকে না। আসলে পরিবার, সংসার, তথা সমাজের সেবার জন্যই তো শরীরের প্রয়োজন, তাতো কখনোই নিজের জন্য নয়। স্থূলশরীরের দ্বারা যে ক্রিয়া, সূক্ষ্মশরীরের মাধ্যমে যে চিন্তা-ভাবনা এবং কারণশরীরে সম্ভাব্য যে স্থিরতা ও সমাধি—এগুলিও আমার জন্য নয়। আমার কাছে, ক্রিয়া বা চিন্তন কিংবা স্থিরতা অথবা সমাধির কোনো ব্যাপারই নেই। এই সবই প্রাকৃত ব্যাপার যা সংসারের কাজেই প্রযোজ্য। আমার স্বরূপ এই সমস্ত কিছু থেকেই নির্লিপ্ত।

শরীরটা যদি আমার জন্যই হত তবে তো সেটি লাভ হলে আমি পূর্ণতৃপ্ত হয়ে যেতাম, আর কিছু প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছাই থাকতো না এবং কখনো আমি শরীর থেকে বিযুক্ত হতাম না, এটি সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকতো। কিন্তু আমরা সবাই বুঝতে পারি যে, শরীর ধারণ করলেই তৃপ্তি হয় না, সব

ইচ্ছাও পূরণ হয় না, পূর্ণতার অনুভব তো হয়ই না এবং এই শরীরও চিরদিন আমার সঙ্গে থাকে না, তা অবশ্যম্ভাবীভাবে ত্যাগ হয়েই যায়। এইজন্যই বুঝতে হবে যে শরীরটা আমার জন্য নয়।

এখানে একটা সংশয় আসতে পারে যে, শরীর যদি আমাদের নাই হয়, তাহলে শাস্ত্রগুলিতে মনুষ্যদেহের এতো মহিমা কেন প্রচারিত হয়েছে। এর মীমাংসারূপে বক্তব্য যে, বস্তুত এই মহিমা শরীরের (আকৃতির) জন্য নয়, তা হল বিবেকের জন্য। আকৃতির নাম 'মানুষ' নয়, প্রকৃতপক্ষে তা বিবেকশক্তিরই নামান্তর। মানবশরীরে মস্তিষ্কটি এমন বিশেষত্ব সহকারে সৃষ্ট যে তার মাধ্যমে সৎ ও অসৎ এবং কর্তব্য ও অকর্তব্যবোধ বিশেষরূপে প্রকাশিত হতে পারে। এই রকম মস্তিষ্ক অন্য কোনো প্রজাতির শরীরে নেই। অন্যান্য (পশু আদি) শরীরে ক্রিয়াশীল বিবেচনা বোধ শুধুমাত্র তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ। এইজন্যই বিবেক-বিরোধী সম্বন্ধগুলিকে ত্যাগ অর্থাৎ 'আমি শরীর নই, শরীর আমার নয়, তথা শরীর আমার জন্য নয়' এই বোধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

উপসংহার

এই শরীরকে 'আমি', 'আমার' বা 'আমার জন্য' মনে করা বিবেকবিরোধী সম্বন্ধ। এইরকম সম্বন্ধ বজায় রেখে কোনো সাধকের পক্ষেই সিদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। দেহাত্মবোধে লিপ্ত থেকে কেউ যতই 'তপস্যা' করুক, 'সমাধি' অভ্যাস করুক, লোক-লোকান্তরের চর্চা করুক কিংবা যজ্ঞ, দানাদি বড় বড় পুণ্যকর্ম করুক, তার বদ্ধতার বন্ধন কোনোভাবেই ছিন্ন হয় না। কিন্তু দেহাত্মবোধ ত্যাগ হলেই তার চেতনার বদ্ধতা কেটে যায় এবং তার বোধে সত্যতত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে। এইজন্যই বিবেকবিরোধী সম্বন্ধগুলিকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত সাধকের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। যদি দেহকেন্দ্রিক সম্বন্ধগুলিকে আমি ত্যাগ না করি তাহলেও এই দেহকে আমি ধরে রাখতে পারবো না, দেহই আমাকে ত্যাগ করবে। যা

আমাকে ত্যাগ করবেই, তাকে আগে থেকেই আমার ত্যাগ করা (অর্থাৎ তার সম্বন্ধে নিরাসক্ত হওয়া) এমন কী কঠিন কাজ ? আমি যে সাধন মার্গেরই পথিক হই না কেন এই সত্যকে আমায় স্বীকার করতেই হবে যে, আমি শরীর নয়, শরীর আমার নয়, তথা শরীর আমার জন্য নয়। কারণ এই শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেওয়াই (অর্থাৎ দেহাত্মবোধই) জীবের মূল বন্ধন অথবা ভ্রান্তিরূপ দোষ, যা থেকে সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়।

শরীর হল সংসারের বস্তু। সাংসারিক কোনো বস্তুকে 'আমি' 'আমার' বা 'আমার জন্য' বলে মনে করাটা তো একরকম মিথ্যাচার, আর এই মিথ্যাচারের শাস্তি হল বারংবার জন্ম-মৃত্যু-রূপ অতীব দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে বদ্ধ থাকা। সেইজন্য সাধকের কর্তব্য হল অকপট নিষ্ঠা সহকারে সংসারের বস্তুকে সংসারেরই মনে করে শরীরকে সংসারের সেবাতেই ব্যাপৃত রাখা আর ভগবানের বস্তুকে অর্থাৎ নিজের আমিত্বকে ভগবানেরই বস্তু রূপে মেনে নিয়ে তাঁরই পাদপদ্মে সমর্পিত করে রাখা। এই শরণাগতির মধ্য দিয়েই সাধিত হয় মনুষ্যজন্মের পূর্ণ সার্থকতা।

——— ০ ———

আপন মানি কাকে ?

নিঃসংশয়ে হৃদয় দিয়ে স্বীকার করে নিতে হয়, 'আমি ভগবানের, এবং ভগবান আমার।' ভগবান জীবকে নিজের অংশরূপে পরিচায়িত করে বলেছেন—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। সুতরাং অংশ হওয়ার কারণে আমি অবশ্যই অংশী ভগবানেরই। ভগবান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কিছুকেই আপন বলে মনে করা খুব বড় ভ্রান্তি। ভগবান ছাড়া বাকি সবই ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশী। কিন্তু এই ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল বস্তুও ভগবানেরই অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত হলেও আমরা অজ্ঞানতাবশত সেগুলিকে ভোগ ও অধিকারের দৃষ্টিতে দেখি।

জগৎ-সংসার সবটাই ভগবানের। সংসারকে নিজের ভোগ ও অধিকারের নিরিখে বিবেচনা করা এক মহা ভুল। সংসার তো খেলনার মতো, যেন ক্রীড়াসামগ্রী। খেলার জিনিস তো যোগতত্ত্ব হতে পারে না, তা তো শুধু খেলার জন্যই। তাতে যখন তখন হার-জিৎ তো আছেই। এই হার বা জিৎ কোনো তত্ত্বের প্রকাশক নয়। তত্ত্ববস্তু তো একমাত্র নিত্যসত্তা পরমাত্মাই। এই পরমাত্মার স্বরূপের বর্ণনা কারোর দ্বারাই কখনো করা সম্ভব নয়। তিনি অনন্ত, অপার, অসীম। বেদ-পুরাণাদি ও অন্যান্য শাস্ত্রে বর্তমান কাল পর্যন্ত পরমাত্মার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে সমস্ত যদি একত্রিতও করা হয়, তাও তাঁর এক অতি ক্ষুদ্র অংশের বর্ণনা রূপে বলা যায় কিনা সন্দেহ! এমন অনন্ত, অপার পরমাত্মার বর্ণনা করা তো কখনোই সম্ভব না, কিন্তু তাঁকে তো আপন বলে মানতে পারি। এইজন্যই ভক্তিমতি মীরা বলেছেন—**'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোই।'** এই হল প্রকৃত তত্ত্ব বোঝার মতো কথা। ভগবান আমার এবং সর্বদাই তিনি আমার থাকবেন। ভগবান ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ আমার সাথে থাকেনই না, থাকতেই পারেন না। তাহলে ভগবান ব্যতীত আর কাকে আমি আপন বলে মানবো ? পরিশেষে ভগবানকেই আপন বলে মানতে হবে। এমন সাথী

তো আর কাউকে পাওয়া যাবে না। বিচার করে দেখি, এই শরীরও কি আমার সঙ্গে সবসময় থাকবে ? পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-কুটুম্ব সর্বদা সঙ্গে থাকবে ? আমার জায়গা-জমি চিরদিন নিজের থাকবে ? সমাদর-মান-যশ-সুকর্ম চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে ? যখন আমার সঙ্গে স্থায়ীভাবে কোনো কিছুই থাকার নয়, তাহলে ওগুলিতে কেন আমি আপন-ভাব রাখবো ? কার সঙ্গে হার্দিক সম্বন্ধ স্থাপন করবো ? কাকে আপন বলে মনে করবো ? যদি অবশে, পরাধীনভাবে বা অগত্যা বাধ্য হয়েও আমাকে মানতে হয় তাহলেও পরমাত্মাকেই আমার আপন বলে স্বীকার করে নিতে হবে। আর কেউ যখন নিত্য সাথী নয় তখন এছাড়া আর কী গতি ? সর্বদা সঙ্গে রয়েছেন একজনই মাত্র, এবং তিনি সেই পরমাত্মাই স্বয়ং। আমরা চুরাশী লক্ষ প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করি, মৃত্যুর পর কর্মফলে স্বর্গে যাই, নরকে যাই, অন্যান্য লোকেও যাই, কিন্তু যেখানেই যাই না কেন অন্তর্যামী তিনি কখনো আমাদের ছেড়ে যান না। আমাদের ছেড়ে উনি যেতেই পারেন না। পরমাত্মার সামর্থ্য অনন্ত হলেও আমাদের ছেড়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। এই ব্যাপারে তাঁর কোনো নড়চড় নেই। সাধু মহাত্মাগণ সঠিকভাবে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করেই একমাত্র ভগবানকে আপন বলে মেনেছেন। তাঁকে হৃদয় ঢেলে সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছেন।

ভগবানের তুল্য সঙ্গী কি কাউকে পাওয়া যায় ? কখনো মেলে না, কোথাও না। আমরা মানি কি না মানি সে কথা আলাদা, কিন্তু কথাটা একেবারে খাঁটি। ভগবান স্বয়ংই পরিষ্কার বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

(গীতা ১৫।৭)

'এই সংসারে জীব মাধ্যমে প্রকাশিত আত্মা স্বয়ং আমারই সনাতন অংশ।'

গোস্বামী তুলসীদাসও বলেছেন—

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখ রাসী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।২)

ঈশ্বরের অংশ হওয়ায় জীবাত্মাও অবিনাশী, চিৎ, নির্মল এবং সহজ সুখরাশি। কিন্তু যা পাওয়া গেলেও হারিয়ে যায় এমন বস্তুকে নিজের বলে মনে করে শুধু দুঃখ পাওয়াই ঘটে। মানুষ কখনো মাতৃবিয়োগে কাঁদে, কাঁদে পিতৃপ্রয়াণে, কখনো স্ত্রীর মৃত্যুতে কিংবা পুত্রশোকে সে কাঁদে, কখনো কাঁদে বন্ধুকে হারিয়ে। সে কখনো ভাবেও না যে, যার জন্য সে কাঁদছে তাকে কেন সে নিজের সাথী বলে মনে করেছিল! সংসারের সকল সম্পর্কই সেবা করার জন্য, নিজের বলে মানার জন্য নয়। সংসারের মানুষদের নিজের বলে মনে করলে একদিন তো কাঁদতেই হবে। যাকে নিজের প্রিয় বলে মনে করি, সে-ই একদিন আমাকে রোদন করাবে— **'প্রিয়ং রোৎস্যতি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।৮)। এইজন্যই আমাদের এমন সাথীকে পেতে হবে যার জন্য কখনো কাঁদতে হবে না। এমন ভুল কেন করবো, যার জন্য পরে কাঁদতে হয় ? কোনো বালক বা যুবকের মৃত্যু হলে তার বৃদ্ধা মাতা বলে থাকেন, 'আমি ভাবতেও পারিনি যে ও আমাদের ছেড়ে কখনো চলে যাবে।' জানা নেই কিন্তু জানতে তো হবেই যে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় চলে যাবে। তাই এমন সাথী পেতে হবে যিনি কখনও আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না। এমন সাথী তো একমাত্র ভগবানই। ভগবান কখনো পরিবর্তিত হন না, কখনো বৃদ্ধ হন না, কখনো তাঁর পক্ককেশ হয় না, তিনি মৃত্যুর অতীত অবিনশ্বর। তাঁর সৃষ্ট এই সংসার তো সেবা করার জন্যই রচিত। সেবার সামগ্রীকে ভোগের সামগ্রী বলে মনে করা তো ভুল। কোন বস্তুর সঙ্গে সংযোগ থাকলে তার সঙ্গে বিয়োগও থাকে, তাই সেটি নিজের বা নিজের জন্য বলে বিবেচিত হতেই পারে না। সেগুলিকে শুধু সেবার বস্তু হিসেবেই মনে করতে হয়। এই কথাটা যদি ঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় তো এই মুহূর্তেই ভ্রান্তি কেটে যাবে। মানুষ যেমন পুণ্যার্জনে দানের জন্য অর্থ ব্যয় করা কালে সেই অর্থকে নিজের বলে মনে করে না, তা দানার্থে ছিল বলে ভাবে, সে রকমই সংসারের সব বস্তুকে নিজের অধিকারের বলে না মনে করে, সেবার বিষয় বলেই ধারণা করতে হয়। ওগুলিকে নিজের জীবন-নির্বাহে ব্যবহারে

কোনো দোষ নেই। নিশ্চয়ই নিজের জীবনধারণে ওগুলি ব্যবহার করা চলে কিন্তু ওগুলিকে আপন বলে মানা ঠিক নয়।

আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতেই বুঝতে পারি যে, কারোরই শরীর স্থায়ী নয়। নিজের সামনে প্রিয় কোনো কিছুর হানি দেখলে মানুষ ক্রন্দন করে। তাই আমাদের অন্তত এই বিচারটা থাকা প্রয়োজন যে, যা হারালে শোকগ্রস্ত হতে হয়, এমন কিছুকে আপন বলে মনে করা অনুচিত। নিজের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যা কিছু আছে তা সবই অপরের সেবার জন্য, নিজের জন্য আদৌ নয়। এমন স্পষ্ট কথাটা কিন্তু সহজে কোথাও দেখতে বা শুনতে পাওয়া যায় না। দীর্ঘকাল অধ্যাত্ম আলোচনা করলেও আমি এমন কথা কোথাও পাইনি। স্থূল শরীরের মাধ্যমে হওয়া ক্রিয়া, সূক্ষ্ম শরীরে হওয়া চিন্তা ও কারণ শরীরে হওয়া সমাধি—এগুলিও অপরের হিতার্থে হওয়া প্রয়োজন, নিজের জন্য নয়। এগুলিতে লক্ষ-কোটি-অর্বুদ বর্ষ ধরে নিরত থাকলেও প্রকৃত তৃপ্তি হবে না। এই সবই নশ্বর, কিন্তু আমাদের স্বরূপ তো সাক্ষাৎ পরমাত্মারই অংশ। চুরাশী লক্ষ প্রজাতিতে জীবন চলা কালে যখন আমার প্রতিটি শরীরের নাশ হয়েছে, তখন বর্তমানের শরীরটিও কি শেষ হবে না ? যে পৃথিবী থেকে এই শরীরের উৎপত্তি, এ শরীর তারই। এই শরীর যেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমন তা হারানোও অনিবার্য।

এই কথাটিকে যদি ঠিকভাবে মেনে নেওয়া যায়, যথাযথভাবে বুঝে নিতে পারা যায় যে, কোনো বস্তুকে যেমন পাওয়া তেমন তা হারাতেও হয়, তা কখনো নিজস্ব হতে পারে না, তাহলেই আধ্যাত্মিক পথে যথেষ্ট অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। যেমন বাল্যাবস্থা নিজের সঙ্গে ছিল, কিন্তু তা এখন বিগত, সেরকমই যৌবনও চলে যাবে, বার্ধক্যও চলে যাবে। যেমন রোগগ্রস্ত দশাও স্থায়ী নয়, নিরোগ দশাও স্থায়ী নয়, দারিদ্র্য যেমন অস্থায়ী, বিত্তবান দশাও তাই। এসবই মানুষকে ত্যাগ করে চলে যায়।

বিচার করতে হয়, এই শরীর কি একসময় ছেড়ে দিতে হবে না ? যা কিছু ধন-সম্পদ আছে তা কোনো না কোনো সময় কি হারাতে হবে না ?

এই গৃহ, জমি, অর্থ, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি সব আমাকে কি ছেড়ে চলে যাবে না ? এগুলি কি আমার কাছ থেকে সরে যাবে না ? আমি কি এগুলির থেকে সরে আসবো না ? বর্তমানে যারা আমার সঙ্গীসাথী তারা কি আমার সঙ্গে চিরদিন থাকবে ? যারা আমাকে ছেড়ে একদিন চলে যাবে, তাদের সেবা করবো, তাদের সুখে তৃপ্ত করার চেষ্টা করবো। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। কিন্তু এটা মনে রাখবো যে নিত্যসাথী একমাত্র ভগবানই। তাঁকে সগুণ মানি, বা নির্গুণ মনে করি, কিংবা দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ যে রূপেই মান্য করি, যাই ভাবি না কেন, তিনিই সর্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ নিত্যসাথী নেই। তিনি ছাড়া আর সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। বড় বড় সাধু মহাত্মাগণের শরীরও চিরদিন থাকেনি, তাহলে আমার শরীরই বা কেমন করে স্থায়ী হবে ? বর্তমান কাল পর্যন্ত এই নিয়মই চলে এসেছে, আজ হঠাৎ ঐ নিয়ম পাল্টে যাবে কী করে ? সেইজন্যই যা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তাতে মোহ রাখতে নেই। কোনো কিছুতেই মোহগ্রস্ত হলে এক সময় তা নিয়ে শোকগ্রস্তও হতেই হবে।

আমি ভগবানের, ভগবান আমার, আমি আর কারোর নই, অন্য কেউও আমার নয়। এই কথাটা উপলব্ধি করতে পারলেই তৎক্ষণাৎ প্রকৃত সুখ-প্রাপ্তি হবে। সেবার্থেই সব কিছুতে আপন ভাব ; সবাই আসলে ভগবানের প্রিয়, এই জন্যই তাদের সবাইকে সেবা করতে হয়। ভগবান বলেছেন, **'সব মম প্রিয় সব মম উপজাএ'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৮৬।২)। সবার সেবা করো কিন্তু কাউকে নিজের বলে মনে করবে না। তাহলেই শোকগ্রস্ত হতে হয় না, দুঃখ দূর হয়ে যায় চিরতরে। কিন্তু নিজের মধ্য থেকে যদি কিছুতেই এই মোহ কাটতে না চায় তো ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়—'হে প্রভু, আমার ঠাকুর ! আমি মোহজালে আটকে গেছি, আমাকে উদ্ধার করুন।' তাহলে অবশ্যই ভগবান মুক্ত করে দেবেন।

——— ○ ———

সর্ব বস্তুই পরমাত্মার

গীতায় ভগবান বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

(৭।৪-৫)

'পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এইরূপ আটভাগে বিভক্ত আমার অপরা প্রকৃতি। হে মহাবাহো, এই অপরা প্রকৃতি থেকে ভিন্ন জীবরূপসম্পন্ন আমার পরা প্রকৃতিকে জান, যার দ্বারা এই জগৎ ধারণ করা হয়েছে।'

সমগ্র সৃষ্টিতে এই আটটি বস্তু ছাড়া কিছুই নেই। এই আটটি পরমাত্মার প্রকৃতি (স্বভাব) হওয়ায় সেগুলি অবশ্যই পরমাত্মার স্বরূপগত। পঞ্চমহাভূত দ্বারা গঠিত শরীর এবং মন, বুদ্ধি তথা অহংকারও ভগবানেরই। এইগুলিকে আমরা যে নিজের বলে মনে করি, সেটাই হল ভুল। জীবও পরমাত্মারই প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় তাও স্বরূপত পরমাত্মাই। এটি বিচার্য যে এই আট প্রকারের অপরা প্রকৃতি এবং জীব ও পরমাত্মা, এই দশটি ছাড়া জগতে আর কী আছে? সব কিছুই পরমাত্মা—'সমগ্র জগৎই ঈশ্বরের রূপ', '**বাসুদেব সর্বম্**' (গীতা ৭।১৯)।

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি—এ সমস্তই পরমাত্মার। এইগুলিকে নিজের বলে মনে করেই আমরা পড়ে গেছি বন্ধনে। এদের নিজের বলে না মনে করলে কোনো বন্ধনও হতে পারবে না। মনকে সর্বতোভাবে ভগবানের বলে মেনে নিতে পারলে মনে কোনো বিকারও আসতে পারবে না, মনের সুখ দুঃখ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যখন সবই ভগবানের, আমার নিজের বলতে কোনো কিছুই নেই, তবে আর আমার

অন্যদের বা অন্য কিছুর সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ! আমার একমাত্র কর্তব্য হল, কখনো ভগবানের প্রকৃতিকে নিজের বলে মনে না করা, মনকে না, বুদ্ধিকেও না এমন কি অহংকারকেও নিজস্ব বলে না ভাবা। এই কর্তব্যটি এখনই করি বা বৎসরান্তে করি কিংবা এই জন্ম পেরিয়ে করি, তার আগে যাবৎকাল এইগুলিকে নিজের বলে মনে করবো আমার ওপর ঝামেলা আসবেই। কই, একটা কুকুরের বিকার কি কখনো আমাকে স্পর্শ করে ? আসলে মনটাকে নিজের বলে ভাবলেই বিকারগ্রস্ত হতে হয়। এই কথাটাই বুঝতে হবে। আমার বক্তব্য এই যে, সমগ্র জীব-জগৎটাই পরমাত্মার স্বরূপগত। এইজন্যই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও অহংকারকে নিজের বলে মনে করতে নেই। এইসব ভগবানে অর্পণ করতে বাধা কোথায় ? একটুও বাধা নেই, কারণ সবাই তো আসলে ভগবানের। এইগুলিকে নিজের বলে মনে করাতেই যতো গোলমাল, যার ফলে পাপ-পুণ্য তথা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হচ্ছে। এদের নিজের বলে না মানলে কোনো বন্ধনও আর থাকবে না, প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্তি হবে।

কাউকে নিজের বলে মনে করা বা না মনে করার ব্যাপারে মানুষ সর্বদাই স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, কখনোই পরাধীন নয়। কেউ কোনো ধর্মশালায় বাসিন্দা হলে, আবশ্যক সব কাজ করে বটে, কিন্তু অন্তরে জানে যে স্থানটি তার নয়। রাষ্ট্রের সম্পত্তিকে কেউ নিজের বলে গ্রহণ করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু তা নিজস্ব না মনে করে যথাযোগ্য ব্যবহার করলে কি তার কোনো শাস্তি হবে ? যদি সত্যিই নিজের কল্যাণ চাই, জন্ম-মৃত্যুর কবলে আর না যেতে চাই তাহলে এই কথাটি মেনে নিতে হবেই যে, সমস্ত কিছুই ভগবানের, কোনো কিছুই আমার নয়। ভগবানও বলেছেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

(গীতা ৭।৭)

'হে ধনঞ্জয়! আমি ছাড়া এই জগতে অন্য বস্তু (কারণ তথা কার্য) কিছুমাত্রও নেই।'

যদি নিজেকে উদ্ধার করতে হয় তো এই সত্য কথাটা স্বীকার করে

নিতেই হবে যে, সমস্ত কিছুই ভগবানের। স্বীকার করা বা না করাটা মানুষের মর্জির মধ্যে। মানুষ শরীরকে নিজের বলে মনে করে অথচ তা তার নয়। একদিন এই শরীরের অন্তিম দশা আসবে, মৃত্যু হবে এবং লোকে এটাকে দাহ করবে। মৃত্যু হলে যেমন শরীর নিজের সঙ্গে থাকে না, তেমনই এখনও তা নিজের সঙ্গে নেই। এই কথাটুকু যদি স্বীকার করে নিতে পারা যায় তো সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে। কেউ বলতে পারে যে, সে একথাটা স্বীকার করতে বা বুঝতে পারছে না। কিন্তু কেন কথাটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না—এনিয়ে অন্ততঃ অন্তরে ব্যথা থাকা উচিত। এই শরীর কি তার নিজের বশে থাকে ? এই কথাটি দিবারাত্র ঠিকভাবে বিচার করতে হবে। তাহলেই কথাটা উপলব্ধি হবে। কারণ সত্যকে কখনো অস্বীকার করা যায় না। দুই আর দুই চারই হবে, কখনও তিন বা পাঁচ হবে না। কেউ তার গৃহকে নিজের বলে মনে করলে, সেটি বেচে দেওয়ার পরও কি সেটিকে সে নিজের বলে ভাববে ? নিজেকেই বিচার করতে হবে কোন্‌টি সত্যকথা। সত্যকথাকে স্বীকার করতে বাধাটা কোথায় ? নিজের মনে প্রত্যয় জাগা দরকার যে 'এখন তো আমাকে সত্যটা মানতেই হবে', কেউ সেটা আজই মানুক, কিংবা কিছুকাল বাদে মানুক, অথবা এই জন্ম পেরিয়েই মানুক—কোনো একদিন তাকে সত্যটাকে মানতেই হবে। যতকাল সত্যকে না মানবে, ততকাল কেউ প্রকৃত সুখী হতে পারবে না। তাকে দুঃখ পেতেই হবে। সত্যকে স্বীকার না করা পর্যন্ত 'মূল বন্ধন' কিছুতেই কাটবে না। সত্য কথাটা মেনে নেওয়া ছাড়া যদি কিছুতেই প্রকৃত শান্তি না পাওয়া যায়, তাহলে কেন আর মিথ্যাকে ধরে থাকবো ? কল্যাণ যখন আসবে, তা সত্যকে মান্যতার মধ্য দিয়ে আসবে।

রামানন্দ আনন্দ সে সিঁবরয়া সরসী কাজ।
ভাবে সিঁবরো কাল হী, ভাবে সিঁবরো আজ॥

এই সব কথা পাঠকের কল্যাণার্থেই উত্থাপিত হচ্ছে, তাঁদের হিতার্থেই কথিত হচ্ছে। তাঁরা যদি মেনে নেন তাতে আমার কিছু প্রাপ্তি হবে না, তাঁরা যদি নাও মানেন তাতেও আমার কোনো ক্ষতি হবে না। আমার উদ্দেশ্য

একটাই, তাঁরা যেন সত্যটাকে মেনে নেন। সত্যকে আগেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত, পরে তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই অনুভূত হবে। মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সব কিছুকে ভগবানেরই বলে মেনে নিতে পারলে, মানুষের সাংসারিক ব্যবহারও উন্নততর হয়ে উঠবে। কোনোভাবেই কোনো ক্ষতি হবে না। এতেও যদি কারোর বিশ্বাস না হয়, তো তিনি আমার সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন। তিনি সত্যকে মেনে চললে যা লাভ হবে তা হবে তাঁর, আর যদি লোকসান হয় তো সেই ক্ষতি হবে আমার। তিনি এটুকু তো বলতে পারেন যে, 'যদিও আমি উপলব্ধি করতে পারছি না কিন্তু কথাটা সত্য'—এটি তো অন্ততঃ তিনি স্বীকার করতে পারেন। সত্যকে স্বীকার করতে বাধাটা কোথায় ?

গীতায় ভগবান বলেছেন,

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (৭।১৯)

অর্থাৎ, 'পরমাত্মাই সব কিছু'—এই অনুভূতিসম্পন্ন মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। যেহেতু দুর্লভ, তাই কেউ যদি এটি মানতে পারছেন না বলেন তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু কী করে এই সত্যকে উপলব্ধি করা যায় তার জন্য তো তাঁর অন্তরে আগ্রহ থাকা চাই। এ বিষয়ে একান্তে একাকী তাঁর বিচার করা উচিত। সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারলে তো, স্বয়ং ভগবান যাকে দুর্লভ মহাত্মা বলে অভিহিত করেছেন, সেই মানুষটি নিজেও সেই মহাত্মা হয়ে যাবেন। সত্যকে অস্বীকারের চেষ্টা না করে, বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তাতে সংসারেও যথার্থ মঙ্গল হবে, পরমার্থ সাধনেও মঙ্গল আসবে। সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে চললে তা উপলব্ধ হবেই, সে আজই হোক বা কিছু দিন, মাস বা বছর পেরিয়েই হোক। সত্যতত্ত্ব অনুভবে আসবেই—এটাই নিয়ম। এইজন্যই সত্যকে আজই এখনই স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন।

সব কিছুই পরমাত্মা—এই কথা স্বীকার করতে হবে। সত্যকথাটি মেনে নেওয়ার প্রয়াসে কখনো হার স্বীকার করতে নেই। কেউ মানুক বা না

মানুক, যা সত্য তা শেষ পর্যন্তই সত্য থাকবে। তাই আগে থেকেই তা মেনে নিলে খুব বড় লাভ। যদি আজই কেউ মেনে নেয়, আর আজই যদি তার দেহত্যাগ হয়, তাহলেও ঐ মেনে নেওয়াটা বিফলে যাবে না। আপন অনুভবে সত্যকে সে যতখানি অনুধাবন করতে পারবে, সেই বোধ তার জন্মান্তরেও নষ্ট হবে না। তার যেখানেই পুনর্জন্ম হোক সেখানেই সে যথাযোগ্য তৈরি পরিবেশ পাবে—

'পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।' (গীতা ৬।৪৪)

কেউ সত্যকে যতখানি গ্রহণ করতে পারবে, ততটাই সে স্থায়ী দৈবীসম্পদযুক্ত হয়ে যাবে। এই সম্পদ্ কখনো নষ্ট হবে না। সৎসঙ্গের সংস্কার কখনো নষ্ট হয় না। কেউ যদি যথার্থই আগ্রহী হয় তো তার এই জন্মেই সত্যতত্ত্বের উপলব্ধি ঘটতে পারে। সত্য কখনো নষ্ট হয় না, আর মিথ্যা কখনো টিকে থাকতে পারে না। সর্বদাই যদি এই ভাবনা জাগ্রত থাকে যে এটিই যথার্থ, তাহলে শীঘ্রই উপলব্ধি হবে। দূরে যদি কোনো মন্দির থাকে আর সেখানে পৌঁছবার সোজা রাস্তাও থাকে তাহলে আমরা সেখানে যেতে পারবোই। এই রকমই আমাদের **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (সবই পরমাত্মা)—এই বোধ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। কারণ এইটিই সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ তথা সত্য কথা। এটি ভগবানের বাণী। ভগবানের তুল্য সুহৃদ আমাদের আর কেউ নেই, হতেও পারে না। এইজন্য এই কথাকে সরলতা সহকারে, শুদ্ধ হৃদয়ে আমাদের এখনই স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

——— ০ ———

সত্য কথা

একজন সাধক প্রশ্ন করেছেন যে, 'সব কিছুই ভগবান'—এই কথাটি বুদ্ধিতে তো ধরতে পারা যাচ্ছে কিন্তু আত্মবোধে অনুভব হবে কেমন করে ? আত্মবোধে এখনই যদি অনুভব না হয় তো কিছু যায় আসে না, দুশ্চিন্তা করারও দরকার নেই। বুদ্ধিতেও বোঝা যাক বা না যাক এইটি মেনে নিলেই হল যে এইটাই সত্য কথা। যদি কথাটি আমার অনুভবে না জাগে, কিংবা বুঝতে না পারি তাহলেও এইটিই আসল কথা। ঘাটতিটা আমার বোঝার ক্ষমতার, ঘাটতিটা সত্যের নয়। এইজন্যই সত্য তত্ত্ব অবশ্যই নিজের প্রকাশের জায়গা করে নেবে, কখনোই তা বাতিল হবে না। আর কারোর কথায় যদি মানা সম্ভব নাও হয়ে থাকে তো আমার বলায় কথাটি অন্তত মেনে নিতে বলছি। অভ্যাসের দ্বারা অনুভব হয় না, কারণ অভ্যাস তো ঘটে জড় মাধ্যমে। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সহায়তা ছাড়া অভ্যাস করা যায় না। জড়ের দ্বারা চেতনের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। চেতনের দ্বারাই চেতনকে লাভ করা সম্ভব। জড়ের দ্বারা সাংসারিক কাজ হতে পারে। পরমাত্মাকে শুধু মেনে নিতে হবে, স্বীকার করে নিতে হবে, কারণ তিনি তো সদা বিদ্যমান ! 'এটি হল গঙ্গা'—এই যে জানা বা মানা, তাতে অভ্যাসের কী আছে ? আগে আমি এটিকে একটি নদীমাত্র বলেই মনে করতাম। কেউ যখন বলে দিলেন যে এটি আসলে গঙ্গা, তখন সেই মেনে নেওয়াটা কি খুব পরিশ্রমসাধ্য ! এইভাবেই মেনে নিতে হবে যে সবই আসলে পরমাত্মা। আমার অনুভব হোক বা না হোক, বুদ্ধিতে ধরা পড়ুক না পড়ুক, সত্যতত্ত্ব তো সত্যই থাকবে। তাকে কেউ বাতিল করতে পারবে না। অন্ততপক্ষে যে সকল ভ্রাতা ভগ্নী সৎসঙ্গ করেন, তাঁরা তো মেনে নিতে পারেন।

সব কিছুই ভগবানের প্রকাশ—এইটি স্বীকার করে নিন, তাহলেই হল, আর কিছু করতে হবে না। আন্তরিকভাবে স্বীকার করলেই কাজ হবে,

কারণ ব্যাপারটাই সেই রকম। এটি কারোর তৈরি করা ব্যাপার নয়। এই সবই পরমাত্মার প্রকাশ—এটি কোনো কাঁচা কথা নয়, একেবারে পাকা কথা। এইজন্যই এতে সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ নেই। এই তত্ত্বকে একবার যদি আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারা যায় তো হয়ে গেল। অটুটভাবে সেই মান্যতা থেকে যাবে। মানুষ অগ্নি-সাক্ষী করে বিবাহ করে। পুরোহিত কন্যাকে বলেন যে, 'পুত্রী, এই হল তোমার বর।' সঙ্গে সঙ্গেই কন্যাটি সেই পুরুষকে স্থায়ীভাবে নিজের বর বলে মেনে নেয়। বর রূপে মেনে নেওয়া মাত্রই তার গোত্র পাল্টে যায়। ক্রমে সে মা হয়, দিদিমা হয়, ঠাকুমা হয়। নাতির স্ত্রী এলে সেই দিদিমা বলেন 'ঘর খোয়ানো পরের ঘরের মেয়ে, এই পরের ঘরের মেয়েটি আমার ঘরকরা খুইয়ে দিল, ব্যাঘাত ঘটালো'! এখন ঐ দিদিমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'মা, আপনি কি এই ঘরেরই মেয়ে?' তিনি কী বলবেন? তাঁর তো মনেই নেই যে তিনিও পরের ঘরের মেয়ে। তিনি তো দেখছেন যে এই ঘরেই তিনি দিদিমা, ঠাকুমা হয়েই আছেন আর এরা সব তাঁর নাতি-পুতি, আত্মীয়-স্বজন। তাই মনের মাঝে সত্যকে স্বীকার করে নিতে হবেই, তারপর বাকি যা দরকার সব ঘটে যাবে। আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নিতে হবে যে, এই সবই ভগবান। এই স্বীকৃতির জন্য শরীরের কোনো সক্রিয়তা লাগে না। শরীরটি রোগগ্রস্থ বা সুস্থ যাই হোক না কেন সত্যকে স্বীকৃতি দিতে তাতে কোনো বাধা হয় না। সব কিছুই পরমাত্মা—এই কথা স্বীকার করে নিতে পারলে 'সংসারে'র অস্তিত্ব ভাবনা দূর হয়ে যাবে এবং সত্য বস্তু পরমাত্মার অস্তিত্ববোধই প্রকাশিত থাকবে।

একটি কাহিনীতে আছে যে, মুম্বাইয়ে একটি ছেলে থাকতো, যার বাবা থাকতেন অনেক দূরে একটি গ্রামে। একবার ছেলেটির অসুখ হল। তার বাবার কাছে খবরটা পৌঁছালে তিনি ঠিক করলেন যে, নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখবেন। দৈবক্রমে তিনি যে ধর্মশালাটিতে উঠলেন, তাঁর ছেলেও সেখানেই তার ঘরের পাশের ঘরটিতে ছিল। ছেলেটির খুব কাসি হচ্ছিল। তার বাবা ধর্মশালার ব্যবস্থাপককে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে,

পাশের ঘরে কোনো ছেলে খুব কাসছে, ফলে তিনি ঘুমোতে পারছেন না, তাই ঐ ছেলেটিকে ঐখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হোক। ব্যবস্থাপক তাই শুনে ছেলেটিকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু অন্য কোনো ঘরই খালি না থাকায় সেই বেচারাকে বাধ্য হয়ে বাইরে বসে থাকতে হল। সকাল হলে বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে নিজের ছেলেকে দেখতে পেয়ে বললেন 'আরে এতো আমারই ছেলে' এবং তাকে তিনি নিজের ঘরেই নিয়ে গেলেন। যাকে তিনি পাশের ঘরেই সহ্য করতে পারছিলেন না তাকে এখন খোদ নিজের ঘরেই নিয়ে গেলেন। প্রথমে বুঝতে পারেননি যে এ তাঁরই সন্তান, কিন্তু দেখা মাত্রই বুঝতে একটুও দেরি হয়নি। এই কাজে কি তাঁর কোনো অভ্যাস করতে হয়েছে ? এই রকমই আমার বলায় মেনে নিন যে এসবই স্বয়ং পরমাত্মা।

গমের ক্ষেত যে চেনে না সে সেখানে ঘাস দেখে, কিন্তু যে চেনে সে ঠিকই দেখে। কারণ প্রথম থেকেই তা গমের ক্ষেত এবং শেষেও তাতে গমই থাকবে। এইরকমই সৃষ্টির আদিতেও পরমাত্মাই ছিলেন এবং অন্তেও পরমাত্মাই থাকবেন, তাহলে মাঝখানে অন্য কিছু আসবে কোথা থেকে ? এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই বহুরূপে প্রকাশিত। তাই মনও তিনি, বুদ্ধিও তিনি, প্রাণও তিনি, ইন্দ্রিয়গুলিও তিনি, দেহাদি অর্থাৎ স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর তথা কারণশরীর সবই তিনি। সমস্ত কিছুই পরমাত্মার প্রকাশ। দ্বিতীয় আর কিছু তো নেই। আপনি দেখতে পান বা না পান, মেনে নিন যে, সবই পরমাত্মা। একসময় ঠিক দেখতে পাবেন, কারণ বাস্তবিকই তিনিই সব হয়ে আছেন। এতে কোনো অসত্য, প্রবঞ্চনা নেই বা ধোঁকা নেই—একদম খাঁটি সত্য কথা। সবই সাক্ষাৎ পরমাত্মা। ভগবান সৃষ্টিকার্যে অন্য কোথাও থেকে কোনো মাল-মশলা কিছু আনান নি। নিজেই নিজের মধ্য থেকে সব রচনা করেছেন। একই বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন—**'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'** (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৬)। এক ঈশ্বর এতো রূপে প্রকাশিত হয়েছেন যে তা গণনা করাও সম্ভব না—

রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্মণ্ড॥

(শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ২০১)

হরি কী লীলা বড়ী অপার।
বন গয়ে আপ অকেলে সব কুছ, নাম ধরা সংসার॥
মাত পিতা গুরু স্বামী বনকর, করে ডাঁট ফটকার।
সুত দারা অরু সেবক বনকর, খুব করে সতকার॥ ১ ॥
কভী রোগকা রূপ বনাকর, বনতে আপ বুখার।
কভী বৈদ্য বন দবা খিলাতে, আপ করে উপচার॥ ২ ॥
কভী ভোগ সুখ মান বড়াঈ, হাজির মেঁ নর নার।
কভী দুখোকা পহাড় পটকতে, মচতী হাহাকার॥ ৩ ॥
কভী সন্ত বনকর জীবোঁ পর, কৃপা দৃষ্টি বিস্তার।
অগণিত জনমোঁ কা দুখ সংকট, ছন মহঁ দেবে টার॥ ৪ ॥
কভী ধরনি পর সন্তন কে হিত, ধর মানুষ অবতার।
অজব অনোখী লীলা করতে, সুমিরত হো ভব পার॥ ৫ ॥
অগণিত স্বাঁগ রচাতে হরদম, ধন্য বড়ে সরকার।
ঐসে পরম কৃপালূ প্রভূকো, বিনবউঁ বারম্বার॥ ৬ ॥

ভগবানই বহুরূপে লীলা করে চলেছেন। না আমি আছি, না তুমি আছো, না এ আছে, না সে আছে। এক ভগবানই আছেন, আমিও তিনিই, তুমিও তিনিই, এও তিনি, সেও তিনি। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ আসবেই বা কোথা থেকে ? কী করে আসবে ? দ্বিতীয় তো নেই-ই কেউ।

একজন সাধু একদিন কোথাও চলেছেন। পথশ্রান্ত হয়ে তিনি কোনো এক ক্ষেতের মধ্যে একটু বিশ্রাম নিতে গেছেন। এমন সময় ক্ষেতের মালিক তাঁকে দেখে ভেবেছে যে,ক্ষেত থেকে যে প্রায়ই শশা চুরি হয় তা নিশ্চয় এই লোকটি করে। এই ভেবে সে এসে সাধুকে পেছন দিক থেকে লাঠির আঘাত করে। কিন্তু পরে তাঁকে সাধু বলে বুঝতে পেরে যখন সে ক্ষমা চাইতে গেছে সাধু তাকে বললেন যে 'তুমি তো আমাকে বুঝে মারোনি, তুমি মেরেছ চোর মনে করে।' লোকটি তখন বলল 'মহারাজ,

এখন কী করি বলুন।' সাধু বললেন, 'এখন যা মর্জি তাই করো।' তখন সে আহত সাধুটিকে গাড়িতে বসিয়ে শহরে নিয়ে গিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেয়। খানিক বাদে অন্য এক ব্যক্তি খানিকটা দুধ নিয়ে এসে সাধুকে সেটি পান করতে বলে। তখন সেই সাধু তাকে বললেন, 'তুমি তো অদ্ভুত লোক ! কখনো লাঠির আঘাত করো, আবার কখনো দুধ পান করাও। তোমার লীলা তো বড় বিচিত্র।' তখন সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বলে, 'না মহারাজ, আমি তো লাঠির আঘাত করিনি।' তাতে সাধুজী বললেন 'তুমিই বলো, দ্বিতীয় আর কেউ আসবে কোথা থেকে ? তুমিই সে, আমি জানি।' এই শুনে ঐ ব্যক্তিটি ঘাবড়ে যায়, 'এই সাধু তো আমাকে ধরিয়ে দেবেন, আমি মিথ্যে ফেঁসে যাবো।' তখন সে সাধুকে বারবার বলতে থাকে যে, 'না মহারাজ, আমি আপনাকে কখনো মারিনি।' কিন্তু সাধু তার কথা কিছুতেই মানতে রাজি নন। তিনি বলেই চলেছেন, 'আমি জানি, তুমিই সেই লোক, সবই তোমার কাজ।' আসলে সাধুর ভাবটা ছিল ভগবানকে কেন্দ্র করে। ভগবান ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ আসবেই বা কোথা থেকে ?

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার— এসব হল 'অপরা প্রকৃতি' আর জীব 'পরা প্রকৃতি'। এই দুই প্রকৃতি ভগবানের স্বভাবগত হওয়ায় সবই ভগবৎস্বরূপ। এইজন্যই সর্বরূপেই ভগবানকে দেখে মগ্ন হয়ে যেতে হবে। সবসময় তৃপ্তিতে থাকা, আনন্দে থাকা। অদ্ভুত প্রভু, সব অদ্ভুত ! কি আনন্দ, অপার আপনার কৃপা, সর্বত্রই আপনাকে দেখছি। আগে আমি এই তত্ত্বটি জানতাম না, এখন আপনার কৃপায় এই তত্ত্ববোধ হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, প্রভু, আপনিই শুধু আছেন, শুধু আপনিই, একমাত্র আপনিই। জড়ও আপনারই প্রকাশ, চেতনও আপনিই। নারীও আপনি, পুরুষও আপনি। মাতৃরূপেও আপনি, পিতৃরূপেও সেই আপনি। পিতামহীও আপনি, পিতামহও আপনি। আমার সকল আত্মীয়-স্বজন সবই আপনি। পশুরূপেও আপনি, পক্ষীরূপেও আপনি। জলচর-নভচর-স্থলচর সবই আপনার প্রকাশ। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ—এ সবই আপনার রূপ। আপনিই নদী, আপনিই পাহাড়,

সমুদ্রও আপনিই। আপনিই সূর্য, আপনিই চন্দ্র, তারকাসমূহও আপনিই। আপনি মনুষ্যরূপে, আবার অসুররূপেও আপনিই। ভূত-প্রেতও আপনারই প্রকাশ, রাক্ষসরূপেও আপনি আবার আপনিই দেবতা। আমিও আপনারই প্রকাশ, সকলেই আপনার প্রকাশ। ঊর্ধ্বেও আপনি, নিম্নেও আপনি। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সর্বদিকেই আপনি। ঈশানকোণেও আপনি, নৈঋতেও আপনি, অগ্নি ও বায়ুকোণেও আপনি। অতীত, বর্তমান এমন কি ভবিষ্যতও আপনারই প্রকাশ, আবার কালাতীতেও সেই আপনিই। অরণ্যেও আপনি, উদ্যানেও আপনি। এই বাঁধা মণ্ডপ রূপেও আপনি, আলোগুলি, পাখাগুলি পর্যন্ত আপনি, থামগুলিও আপনি। বৃক্ষরূপে প্রকাশও আপনারই, গৃহরূপেও আপনি। যা দেখা যায় সে সবই যেমন আপনি, যা দেখা যায় না তাও আপনিই। সিংহরূপেও আপনি, ভাল্লুকরূপে, বাঁদররূপেও আপনি। সাধুরূপেও আপনি, আবার গৃহীরূপেও আপনি। অন্নরূপেও আপনি, বিভিন্ন রকমের ফসলরূপেও আপনি। ক্ষুধাতেও আপনি, তৃষ্ণায়ও আপনি। শায়িত আপনিই, আবার আপনিই উপবিষ্ট।

বিভিন্নরকম সর্বরূপে আপনিই। আপনি ছাড়া আর কেউ নেই-ই, কেউ হয়নি, হবে না, হতেও পারে না। সর্বরূপেই কেবলমাত্র আপনি। রাগ-রাগিনীও আপনি, তাল-স্বর রূপেও আপনি, বাদ্য-বাদনও আপনি। গায়ক আপনি, আবার তা শুনছেনও আপনি। বক্তাও আপনি, শ্রোতাও আপনি। গ্রামও আপনি, কুটীরও আপনি। মাটিও আপনি, বাসনও আপনি। অস্ত্র-শস্ত্রও আপনি। খেলা আপনি, আবার খেলোয়াড়ও আপনি। হে প্রভু ! আপনি কতো বিচিত্র রূপ ধারণ করে আছেন, কত রকম রূপ ধরে রয়েছেন। অনন্ত, অসংখ্য সর্বরূপে কেবল আপনারই প্রকাশ, আপনারই প্রকাশ।

——— ০ ———

পরমাত্মপ্রাপ্তিতে বিলম্ব কেন ?

পরমাত্মবোধের উদ্দেশ্য নিয়ে যে সকল মানুষ এগিয়ে চলেছে তারা প্রত্যেকেই সেই বোধটি অবশ্যই লাভ করবে। কিন্তু কবে, কত জন্ম বাদে তা সম্ভব হবে তা বলা সম্ভব নয়। শরীরটিকে নিজের তথা নিজের জন্য বলে মনে ধারণা রেখে কেউ যদি সাধন করে চলে তবে তাকে কতবার জন্মাতে হবে, কতরকম প্রজাতিতে দেহ ধারণ করতে হবে, তার তো কোনো ঠিক নেই। এইজন্য গোড়া থেকেই আমার নজর হল, কেমন করে পরমাত্মবোধে মানুষ দ্রুত পৌঁছতে পারে সেইটি দেখা। যদিও কারোর সাধনা, তা যতটুকুই হয়ে থাক না কেন, নিষ্ফলে যায় না, তবুও কী করে তাড়াতাড়ি উত্তরণ লাভ করা যায় এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই নজর বা একাগ্রতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। একাগ্রতা না থাকলে তো অনেক জন্ম লেগে যাবেই। কিন্তু যা কাল মিলতে পারে, তা আজই পাওয়া চাই, এখনই পাওয়া চাই। পরমাত্মা তো আছেনই, সাধকও প্রস্তুত, তবে বিলম্ব কিসের জন্য ? পরমাত্মবোধের সাধনে বিলম্ব হওয়ার কথা শুনলেও আমার অসহ্য লাগে। যে কাজ অবিলম্বে হওয়া সম্ভব, তাতে দেরি কেন ? যে কাজ এখনই হতে পারে, তা কালকের জন্য থাকবে কেন ?

শ্রীশরণানন্দ মহারাজ লিখেছেন যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য কখনো হয়নি, তা হতেও পারে না। অর্থাৎ জীবত্ব কাটলে তবেই ব্রহ্মবোধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এটি সূক্ষ্ম বিবেচনার কথা। এই কারণেই বলা হয় যে, সাধুর পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় না, গৃহীরও পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় না। ব্রাহ্মণেরও হয় না। আসলে এর তাৎপর্য হল যে, সাধুত্বের অভিমান যতকাল থাকবে পরমাত্মপ্রাপ্তি হতেই পারবে না। ব্রাহ্মণত্বের অভিমান থাকলেও পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। অহং-অভিমান চলে গেলেই প্রাপ্তিও হবে। এতসব কথা বলার উদ্দেশ্য হল একটাই, পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনে একদম বিলম্ব করতে নেই। কারোর যতই পাপ-তাপ থাক, সে যতই পাপিষ্ট-

দুরাচারী হোক, তার যদি ঠিক অনুসন্ধিৎসা জেগে যায় তো আজই পরমাত্মবোধে জাগৃতি সম্ভব।

সাধ্যবস্তুর প্রাপ্তি তো শুধু সাধকেরই হতে পারে, ব্রাহ্মণ বা সাধু পরিচয়ে অভিমানীদের তা হবে কেমন করে ? কেউ ব্রাহ্মণ হলে তার বিয়ের জন্য ব্রাহ্মণ-কন্যা নিশ্চয়ই মিলতে পারে, পরমাত্মা নয়। সাধু পরিচয়ে কারোর ভিক্ষা লাভ হতে পারে অবশ্যই কিন্তু পরমাত্মপ্রাপ্তি কেমন করে হবে ! শরীরধারী বলে নিজেকে মনে করলে পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। সাধকের পরিচয়, শরীরধারী রূপে নয় ; আবার শরীরধারী বোধে থেকে সাধকও হওয়া যায় না। নিজেকে পুরুষ কিংবা নারী বলে মনে করলে পরমাত্মপ্রাপ্তি হবে কেমন করে ? আমি পুরুষ বা স্ত্রী নয়, আমি তো ভগবানের—এইরকম ভাব অবলম্বন করলে খুব তাড়াতাড়ি লক্ষ্যসিদ্ধি হবে। নিজেকে নারী কিংবা পুরুষ মনে করা তো জাগতিক ব্যবহারের জন্য। কিন্তু পরমার্থের পথে চলতে গেলে, নিজেকে নারী বা পুরুষ বলে মনে করলে অনেক অনেক দেরি লাগবে। চিন্ময় সত্তাকে চিন্ময় সত্তাই লাভ করতে পারে, জড়ের দ্বারা তা কী করে সম্ভব ?

সাম্যবোধে উত্তরণকে খুব উঁচু দশা বলে অভিহিত করা হয়। গীতাপ্রেসের সংস্থাপক শ্রীজয়দয়াল গোয়ন্দকা লিখেছেন যে, গীতা অনুযায়ী কারোর চেতনায় সমত্বের বোধ এসে গেলে অন্য দ্বিতীয় কোনো লক্ষণ আসুক বা না আসুক পরমাত্মপ্রাপ্তি তো হবেই, আবার সমত্ববোধ যদি না আসে তো যত বিশিষ্ট লক্ষণই কারোর মধ্যে দেখা যাক না কেন, পরমাত্মপ্রাপ্তি কিন্তু হবে না। চেতনায় এই সমত্ববোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে, মমত্ববোধ দূর হওয়া মাত্রই।

তুলসী মমতা রাম সোঁ, সমতা সব সংসার।

(দোহাবলী ৯৪)

শ্রীশরণানন্দ মহারাজ অতি স্পষ্টভাবেই লিখেছেন যে, মমত্ববোধ ছেড়ে দিলেই সমত্ববোধ এসে যায়। উনি আরও লিখেছেন যে, নিজের জন্য তপস্যা করাও ভোগ, কিন্তু পরমাত্মার জন্য ঝাড়ু দেওয়া পর্যন্তও পূজা রূপে

বিবেচ্য। হিরণ্যকশিপু কত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা পর্যন্ত বলেছিলেন যে এমন তপস্যা কেউ কখনো করেনি। কিন্তু তাঁর তপস্যায় কি পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়েছে ? তাঁর তো পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যই ছিল না। এই সব কথার তাৎপর্য একটাই, তা হল অবিলম্বে পরমাত্মাকে লাভ করা।

যদি পরমাত্মপ্রাপ্তির একান্ত আগ্রহ থাকে তাহলে নিজেকে পুরুষ বা নারী না মনে করে, নিজের সম্বন্ধটা গড়ে নিতে হয় পরমাত্মার সাথে। শরীর ধারণ হয়েছে বটে কিন্তু শরীর-ত্যাগও অবশ্যম্ভাবী। এই শরীরের বোধেই যদি আটকে পড়া যায় তাহলে আর পরমাত্মবোধ লাভ হবে কী করে ? একমাত্র পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হলেই তবে পরমাত্মলাভ হয়। কেউ কুপুত্র হোক বা সুপুত্র, পুত্র তো সে বটেই। কুপুত্রও সন্তান, সুপুত্রও সন্তান। সেই রকমই, আমরা যেমনই হই না কেন, ভালো বা মন্দ যাই হই না কেন, আমরা পরমাত্মারই। পরমাত্মার প্রাপ্তি নারীরও হয় না, পুরুষেরও হয় না। যদি বিবাহ সম্বন্ধ করতে হয় তবেই নারী পুরুষ ব্যাপারটা বিবেচ্য। নারী পুরুষকে পেতে পারে, কিন্তু পরমাত্মাকে লাভ হবে কেমন করে ! পুরুষেরও লাভ হবে নারী, পরমাত্মাকে লাভ হবে না। একমাত্র সাধকই লাভ করবে পরমাত্মাকে। সাধক তো স্বয়ং 'আমি' বোধ, তা শরীর নয়। মুক্তিও হয় আমিত্বের, শরীরের নয়। সুতরাং আমি নারীও নয়, পুরুষও নয়, আমি পরমাত্মার। পরমাত্মা আমার। আমি আর কারোরই নই। অন্য কেউও আমার নয়। যা প্রার্থিত, তার সাথে তো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চাই। এইজন্য পরমাত্মার সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনে নিজেকে নারী বা পুরুষ ভেবে মেনে চললে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে নিজেকে নারী বা পুরুষ ভেবে চলে সে তো শরীর-বোধেই আটকে আছে। তার আর পরমাত্মপ্রাপ্তি হবে কী করে ? আমি ভগবানের, ভগবান আমার—এই ভাব মেনে নিয়ে চললে তা খুবই সাধন-সহায়ক হয়। এটা হাল্কা ভাবের সাধনা নয় ; ভগবান এবং নিজের স্বরূপ এক হয়ে গিয়েছে, সেইটিই বাস্তব।

জাতি, কুল, বিদ্যা, সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয় ধরে অভিমান পরমাত্ম-

প্রাপ্তির পথে বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভগবানের যে স্বরূপ, আমারও তাই। ভগবানের সাথে আমার সম্বন্ধই আসল, বাকি সব রকম সম্বন্ধই নকল। আমি ভগবানের অংশ, **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। আমি সংসারের অংশ নয়। আমরা সাক্ষাৎ ভগবানের পুত্র-কন্যা। জাগতিকভাবে নারী বা পুরুষ আমরা পরে হয়েছি—**'সো মায়াবস ভয়উ গোসাঈ'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।২)।

এখানে সংশয় হতে পারে যে, 'আমি ভগবানের কন্যা'—এইরকম ভাবলে তো নিজেকে নারীরূপে ভাবাটা থেকেই যাবে। কিন্তু আসলে তা নয়। যদি ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে নারীভাব থেকেও যায়, তাহলে তা আপনা থেকেই চলে যাবে। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধের এমনই জোর যে তা অন্য সব সম্বন্ধকেই সরিয়ে দেয়। কারণ সব সম্বন্ধই মিথ্যা, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য। ভগবান বলেছেন যে, জীব শুধু আমারই অংশ **'মমৈবাংশো জীবলোকে'**। সত্যতত্ত্বের সামনে মিথ্যা টিকে থাকবে কেমন করে ? আবার মানুষ যদি 'আমি নারী' বা 'আমি পুরুষ' এই ভাবকে গুরুত্ব দিতেই থাকে তবে তা দূর হবে কেমন করে ? **'জদপি মৃষা ছূটত কঠিনঈ'**। এইজন্যই এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে কখনো আপন বলে মনে করা উচিত নয়—**'মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো ন কোই।'** এ জীবনে ভগবানকে পাওয়া যাক বা না যাক, তাঁর দর্শন লাভ হোক বা না হোক, আমি কিন্তু ভগবানেরই। ভরত বলেছেন—

জানহুঁ রামু কুটিল করি মোহী। লোগ কহউ গুর সাহিব দ্রোহী॥
সীতা রাম চরন রতি মোরেঁ। অনুদিন বরউ অনুগ্রহ তোরে॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড ২০৫।১)

আমি যেমনই হই, আমি ভগবানের। যদি ভালো হই তাহলেও ভগবানের, যদি খারাপ হই তাহলেও তাঁরই। বিবাহিতা স্ত্রী যেমন অন্তরে নিজেকে কুমারী বলে ভাবতে পারে না, সেরকমই ভক্তও ভগবান ছাড়া আর কাউকে আপন বলে মেনে নিতে পারে না। মিথ্যাকে মানা যাবে কী করে ? ভগবানকে সব মানুষই নিজের বলে মনে করতে পারে। মহাপাপী

কিংবা অতি দুষ্ট ব্যক্তিও ভগবানকে নিজের বলে ভাবতে পারে। কারণ, এইরকম মনে করাটাই ঠিক, আর সব ভুল, মিথ্যা। কাউকে যদি সংসারের সবাই বলে যে 'তুমি ভগবানের নও', তাহলে সে যেন তাদের বলে যে 'তোমরা কিছু জানো না।' এমন কি স্বয়ং ভগবানও যদি বলেন যে 'তুমি আমার নও' তাহলেও তাঁকে পর্যন্ত বলা যাবে যে 'আপনার ভুল হতে পারে কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না।' এইরকম দৃঢ় ধারণা থাকা চাই।

অস অভিমান জাই জনি ভোরে। মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১১।১১)

এইরকম দৃঢ়তাসহ ভগবানের প্রতি আপনবোধ হয়ে গেলে পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে কোনো বিলম্ব হতে পারবে না।

——— o ———

কল্যাণপ্রাপ্তির নিশ্চিত উপায়

ভগবান জীবের ওপর কৃপা করে তার নিজের কল্যাণ সাধনের জন্য মনুষ্য শরীর দিয়েছেন। নিজের কল্যাণ সাধন করা ছাড়া মনুষ্যজন্মের দ্বিতীয় কোনো প্রয়োজনই নেই। শরীর, ধন-সম্পদ, জমি-বাড়ি, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি যা কিছু জাগতিক বিষয় আছে তার সমস্তই যেমন লাভ হয় তেমনই তা হারাতেও হয়। তাই যে যতই ধনী হয়ে উঠুক, বলশালী হয়ে উঠুক, বিদ্বানে পরিণত হোক, উচ্চপদস্থ কর্মী হোক, কিংবা বহু আত্মীয়-স্বজনসম্পন্ন হোক, প্রকৃত কল্যাণ না হলে এসব কোনো কিছুই আসলে কাজে লাগবে না, বর বিনা বরযাত্রী-দলের মতো, তার সমস্ত সাংসারিক ভোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই জন্য মানুষের আসল কর্তব্য হল— নিজের কল্যাণ সাধন করা।

এই কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজের কল্যাণ সাধনে মানুষমাত্রই সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র, সমর্থ, যোগ্য তথা অধিকারী। কারণ ভগবান জীবকে মনুষ্যশরীর দিলে তার সাথে, সেই জীব যাতে নিজের কল্যাণে সচেষ্ট হতে পারে তার জন্য তাকে স্বাতন্ত্র্য, সামর্থ্য, যোগ্যতা তথা অধিকারও দিয়ে দেন।

এখন প্রশ্ন হল মানুষ নিজের কল্যাণের জন্য কী করবে ? এর উত্তর হল, মানুষ যদি নিম্নোক্ত চারটি কথা দৃঢ়ভাবে মেনে নেয় তাহলে তার ঠিক কল্যাণ হবে—

১. আমার কিছুই নেই।

২. আমার কিছুই চাই না।

৩. আমার কারোর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।

৪. কেবল ভগবানই আমার।

যেসব বিষয়ের প্রাপ্তি হলেও বিচ্ছেদও অবশ্যম্ভাবী, এমন কিছুকে নিজের বলে মনে করাটাই মূল দোষ, যা থেকে অন্য সমস্ত দোষগুলির উৎপত্তি হয়। প্রকৃতপক্ষে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্রতম বস্তুটি পর্যন্ত নিজের

নয়। এই কারণেই 'আমার কিছুই নেই'—এই কথা মেনে নিলে জীবনে নির্দোষ নির্মল ভাব জেগে ওঠে। এই ভাবটি এলেই মানুষ ধর্মাত্মা পদবাচ্য হয়ে যায়।

আমার যখন কিছু নেই-ই, তাহলে আর আমি কোন্ বস্তুর চাহিদা রাখবো ? সুতরাং 'আমার কিছুই চাই না'—এই কথা মেনে নিলেই জীবনে নিষ্কামভাব এসে যাবে। নিষ্কাম ভাব এলেই মানুষ যোগী হয়ে যায় অর্থাৎ তার সমত্বরূপে যোগ-প্রাপ্তি হয়ে যায়—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)। কোনোরকম কামনা না থাকলে জীবের চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ-প্রাপ্তি হয়ে যায়—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (যোগদর্শন ১।২)।

মানুষ মাত্রেরই স্বরূপ স্বাভাবিকভাবেই অসঙ্গ—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। সুতরাং প্রাপ্তি ও বিচ্ছেদ দুই-ই অবধারিত বলে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার না করে যদি কেউ থাকতে পারে, তবে সে নিজের স্বরূপের অসঙ্গতা অনুভব করার ফলে জ্ঞানী হয়ে যাবে।

জীবমাত্রেই পরমাত্মার অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। আমি ভগবানের অংশ হওয়ার ফলে কেবল ভগবানই আমার নিজের। ভগবান ছাড়া আর কেউ আমার নয়। এইভাবে ভগবানকে আপনবোধে মেনে নিলেই মানুষ যথার্থ ভক্ত হয়ে যায়।

ধর্মাত্মা, যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত হওয়ার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে। এই হওয়ায় কাঠিন্যও নেই, কারণ প্রকৃতপক্ষে মানুষমাত্রেরই স্বরূপ নির্দোষ, নিষ্কাম, অসঙ্গ এবং ভগবানের অংশ। অর্থাৎ আমাদের স্বরূপ হল অস্তিত্বমাত্র। এই অস্তিত্বে বা সত্তায় নির্দোষতা, নিষ্কামতা ও অসঙ্গতা স্বতঃসিদ্ধ এবং এই সত্তা ভগবানের অংশ। এইজন্য সাধকের কর্তব্য হল পূর্বোক্ত চারটি কথাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নেওয়া। তাহলে তার কল্যাণ একেবারে সুনিশ্চিত।

——— ০ ———

অভ্যাসের দ্বারা বোধ সম্ভব নয়

আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে প্রতিটি কাজই অভ্যাসের দ্বারা সম্ভব ; তাই তত্ত্বজ্ঞান লাভও অভ্যাসের দ্বারা হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভ্যাসের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হতে পারে না। এটি খুব গভীর তথা অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা। অভ্যাসের দ্বারা একটা নতুন দশা সৃষ্ট হতে পারে বটে কিন্তু জাগতিক সম্বন্ধের বন্ধন তাতে কাটে না। এটি খুবই মননযোগ্য কথা। কাউকে এই কথাটি বোধ করিয়ে দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু এটি আমার অনুভূত কথা। অভ্যাসের দ্বারা একটা অবস্থালাভ হয়, কিন্তু 'বোধ' হয় না। অভ্যাসের জন্য সময় লাগে, কিন্তু পরমাত্মপ্রাপ্তি সঙ্গে সঙ্গে হবার বিষয়। যেমন দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা প্রথম চেষ্টামাত্র সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব নয়। তার জন্য অভ্যাস করতেই হবে। অভ্যাস ছাড়া কেউ দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারে না। কিন্তু দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়—এটি বুঝতে অভ্যাস লাগে না। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সময়ের কোনো অপেক্ষাই নেই। বরং যার মধ্যে অভ্যাসের সংস্কার আছে, সে এই তত্ত্ব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে না।

অভ্যাস ও অনুভবে অনেক তফাৎ। অভ্যাসের দ্বারা অনুভব সম্ভব হয় না, বড় জোর এক নতুন অবস্থা সূচিত হতে পারে মাত্র। পরমাত্মতত্ত্ব সমস্ত দশার অতীত। এটি কোনো দশার সাপেক্ষে লাভ হয় না—এই কথাটি খুবই অনুধাবন যোগ্য। কিন্তু যিনি অত্যধিক সৎসঙ্গ করেন বা খুব বেশি শাস্ত্রচর্চা করেন তাঁর পক্ষে এই কথাটি বোঝা কঠিন। আমি নিজে এই ব্যাপারে ভুক্তভোগী। আমি প্রচুর অধ্যয়ন করেছি এবং বহু বছর ধরে অভ্যাসও করেছি, এই কারণেই ব্যাপারটা আমার জানা হয়ে আছে। আমি যোগের অভ্যাস করেছি, বেদান্তচর্চা করেছি, ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য, ন্যায়ের চর্চা করেছি। বেদান্তের 'আচার্য' উপাধি লাভের পরীক্ষা পর্যন্ত এগিয়েছি। যদিও আমি নিজেকে খুব বিদ্বান মনে করি না, কিন্তু বিদ্যাভ্যাস আমার যথেষ্টই হয়েছে। এইজন্যই আমার মতো ব্যক্তির কল্যাণ তাড়াতাড়ি হতে পারেনি। যার মধ্যে এই ধারণা হয়ে আছে যে, অভ্যাসের দ্বারা কল্যাণ

হয়, তার তাড়াতাড়ি কল্যাণ লাভ হতে পারে না।

কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য তিনটি কথা মুখ্য—আমি শরীর নই, শরীর আমার নয় এবং শরীর আমার জন্য নয়। এতে অভ্যাস কী করবে ? অভ্যাস করতে করতে বছরের পর বছর কেটে যাবে কিন্তু 'বোধ' হবে না। অভ্যাস ছাড়াই এখন এই মুহূর্তেই 'বোধ' হতে পারে, অন্তঃকরণের দশা যাই হোক না কেন। কেউ একথা মানলো কি না মানলো তা জানার কোনো আগ্রহ আমার নেই। কিন্তু আমার জানা, অনুভূত কথাটি হল যে অভ্যাসের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হতে পারে না। অভ্যাসের দ্বারা কেউ বিদ্বান হতে পারে কিন্তু তাতে তত্ত্বজ্ঞান হবে না। কেউ যতই অভ্যাস করুক না কেন, 'আমি শরীর নই, শরীর আমার নয় এবং শরীর আমার জন্য নয়' এই তিনটি কথা অন্তর থেকে প্রকাশিত হয় না। স্বরূপের বোধ অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার মতো বিষয়ই নয়। অভ্যাসের দ্বারা নতুন অবস্থা লাভ হতে পারে, কিন্তু তত্ত্ব তো যে কোনো অবস্থারই অতীত বিষয়। স্থিতিতে তত্ত্ব নেই, আর তত্ত্বে স্থিতি নেই। এইটিকে যদিও সহজাবস্থা বলা হয় কিন্তু আসলে এটি কোনো অবস্থা বা দশা নয়। সর্ব অবস্থার অতীত তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাসের দ্বারা লাভ করা যায় না, সেটি যখন হয় সঙ্গে সঙ্গে হয়। যে বস্তু যেমন, তাকে ঠিক তেমনটি জানায় অভ্যাসের কোনো ব্যাপার নেই। অভ্যাস করতে হলে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্য নিতে হয়। তত্ত্ববোধের জন্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সমূহের কোনো প্রয়োজনই তো নেই। তত্ত্ববোধ গাছের ফসলের মতো নয় যে, তার ফলনের জন্য সময় লাগবে। দশার পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেই সময় লাগে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে, মল-বিক্ষেপ-আবরণ দোষ দূর হবে, তবে বোধটি প্রকাশিত হবে—এই প্রক্রিয়াও আমি করে দেখেছি। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ববোধ লাভের জন্য অন্তঃকরণ শুদ্ধির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হল অন্তঃকরণের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তার বিচ্ছেদ। শুধুমাত্র তত্ত্ববোধের জন্যই যখন ব্যাকুলতা খুব বেড়ে যাবে, তখনই তার প্রাপ্তি তাড়াতাড়ি ঘটতে পারবে।

মানুষের অন্তরে অভ্যাসের সংস্কার এমনভাবে প্রোথিত হয়ে রয়েছে যে প্রত্যেকের মধ্যেই প্রশ্ন ওঠে এরপর কী করবো ? আপনি হয়তো কোনো কিছু জানালেন, সেটি শুনে এরপর 'আমি এখন কী করবো ? কী

করবো ?'—এটাই জিজ্ঞাস্য থাকে। যদি সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তাহলে 'আমি শরীর নই' এই কথাটা মেনে নিতে হবে। একজন আরেকজনকে বলেছিল, 'দুই আর দুইয়ে যোগ করলে কত হয়, এর যদি ঠিক উত্তর দিতে পারো তো তোমাকে একশ টাকা দেবো।' দ্বিতীয়জন উত্তর দিয়েছিল—'চার হয়।' তখন প্রথম জন বলল, 'না তা হয় না।' দ্বিতীয়জন যতই বলে যে, দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, প্রথম জন ততই তা অস্বীকার করে, বলে না তা হয় না ! এখন তাকে বোঝানো কার সাধ্য ! লোকটি তো বুঝতেই চায় না।

মানুষের শুধু এটাই বোঝা দরকার যে, 'আমি শরীর নই'। সে নিজের ঘড়িটা নিয়ে বলে, 'ঘড়িটা আমার', কিন্তু কখনো বলে না 'আমি ঘড়ি'। কিন্তু শরীরের ক্ষেত্রে 'শরীরটা আমার' একথা যেমন বলে, আবার 'আমি শরীর' এটাও বলে। 'আমি শরীর' এই কথা শরীরের সাথে অভেদ ভাবের সম্বন্ধবাচক, আর 'শরীরটা আমার'—এই কথা ভেদভাবের সম্বন্ধ পরিচায়ক। মানুষের এক ধরণের কথাই বলা উচিত, তা অভেদভাবের সম্বন্ধের হোক বা ভেদভাবেরই হোক। একই শরীরকে একবার 'আমি' বলা আবার 'আমার' বলা তো একেবারে ভুল।

জীবকে যে চুরাশী লক্ষ প্রজাতিতে জন্ম নিতে হয়, তার প্রতিটি জন্মে তার একটি করে শরীরকে ত্যাগ করতে হয় তবে সে পরের শরীরটিতে যায়। যখন এই চুরাশী লক্ষ প্রজাতির শরীরের কোনোটাই জীবের সঙ্গে থাকে না, তাহলে এই শরীরই বা তার সঙ্গে কী করে থাকবে ? আগের শরীরগুলি যদি তার না হয় তো বর্তমান শরীরটিই বা তার কেমন করে হবে ? শরীর তো চলে যাবেই। সুতরাং সহজ-সরল কথাটি হল এই যে, 'আমি শরীর নই' এই বোধের ব্যাপারে অভ্যাসের কোনো ভূমিকা নেই।

যতকাল অহংভাব (অভিমান) থাকবে, ততকাল আত্মবোধ হবে না। অহংভাব কাটলেই ব্রাহ্মী স্থিতি হবে—

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি॥

(গীতা ২।৭১-৭২)

অহংকার অপরা প্রকৃতি আর জীব পরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতির সম্বন্ধ পরমাত্মার সাথে, অপরার সাথে নয়। অহংকারকে আঁকড়ে থাকলে বোধ জাগবে কী করে ? অনেক বছর আগে আমি একবার বলেছিলাম **'অহং ব্রহ্মাস্মি'** (আমি ব্রহ্ম) বলা ঠিক নয় ; অহং ব্রহ্মাস্তি (আমি হল ব্রহ্ম) বলাই ঠিক ! ব্যাকরণের দৃষ্টিতে এমন কথা বলা অশুদ্ধ, কারণ 'অহম্'-এর সঙ্গে 'অস্মি'ই ব্যবহৃত হয় 'অস্তি' নয়। কিন্তু আমার ঐ রকম বলার কারণ ছিল এই যে, 'অহম্' যদি সঙ্গে থাকে তাহলে তো বোধ হবে না। 'অহং নাস্মি, ব্রহ্ম অস্তি' (আমি নয়, ব্রহ্মই আছেন)—এইরকম বিভাজন করে নিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। 'অস্মি' থাকলে তার সাথে অহংকারও থাকবেই। এই অহংকার অভ্যাসের দ্বারা কখনো দূর হতে পারে না, তা সে বিশ বছর চেষ্টা করলেও না। এটি খুবই মননযোগ্য কথা।

সিদ্ধান্ত হল এই যে, যে বস্তু পাওয়া যায় আবার যা ত্যাগও করতে হয় তা নিজের হতে পারে না। শরীর লাভ হয়েছে, আবার তা চলেও যাবে, তাহলে সেটি নিজের হবে কী করে ? পরমাত্মা ঐ রকম মিলন ও বিচ্ছেদের বিষয় নন। তিনি সর্বদাই প্রাপ্ত আছেন এবং কখনো ছেড়ে যান না। তাঁকে অনুভব করা যাচ্ছে না বলে দুঃখবোধ হচ্ছে না, ফলে দেরিটা লাগছে। তাঁকে যথাযথভাবে পাওয়ার আগ্রহ হচ্ছে না। তাঁকে প্রকৃতই চাইলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে পাওয়া যাবে। পরমাত্মপ্রাপ্তি শরীরাদি জড়পদার্থ দ্বারা ঘটে না, বস্তুত তা সম্পন্ন হয় ঐগুলি ত্যাগের মাধ্যমে। মন-বুদ্ধির সহায়তায়ও 'বোধ' হয় না। ঐগুলির ত্যাগের মধ্য দিয়েই বোধটি জাগে।

যোগদর্শনে অভ্যাসের পরিচয়ে বলা হয়েছে—

তত্র স্থিতৌ যত্নোভ্যাসঃ। (১।১৩)

'কোনো একটি বিষয়ে স্থিতি পাওয়ার জন্য বারংবার চেষ্টা করার নাম অভ্যাস।'

আসলে তত্ত্ববোধ কোনো স্থিতির নাম নয়। যেখানেই স্থিতি আছে, সেখানে গতিও আছে। এই-ই নিয়ম। তত্ত্ববোধ স্থিতি ও গতি দুইয়েরই অতীত বিষয়। তত্ত্বে স্থিতিও নেই, গতিও নেই, নেই স্থিরতা কিংবা কোনোরকম চাঞ্চল্য। যেমন ক্ষুধা বা পিপাসার জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন

হয় না, তেমনই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার জন্যও অভ্যাস করতে হয় না। আমাদের স্বভাবই হয়ে গেছে অভ্যাস করা, তাই অভ্যাসযুক্ত সাধনার কথাই আমাদের মনঃপুত হয়।

আমি অভ্যাসের বিরোধিতা করছি না। অভ্যাস করতে করতে একের পর এক নতুন দশার মধ্য দিয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার স্ফুরণে মানুষের তত্ত্বপ্রাপ্তি হতে পারে। কিন্তু সেটি হবে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। কত জন্ম যে লেগে যাবে তার ঠিক নেই। পরিশেষেও যখন অভ্যাসের সঙ্গে সম্বন্ধ বিদূরিত হবে, অর্থাৎ (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিরূপ) জড়তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ দূর হবে শুধু তখনই তত্ত্বপ্রাপ্তি সম্ভব হবে। তত্ত্বপ্রাপ্তি জড়তার দ্বারা হয় না, বস্তুত জড়তার ত্যাগেই তা হতে পারে—এই হল সিদ্ধান্ত। জড়তার সহায়তা ছাড়া তো কোনোরকম অভ্যাস করা সম্ভবই নয়। তাই অভ্যাসের দ্বারা কখনো জড়তার ত্যাগও সম্ভব নয়। যার সহায়তায় অভ্যাস করা হচ্ছে, তারও ত্যাগ অভ্যাস দ্বারা কেমন করে সম্ভব ? কিন্তু অভ্যাসের সংস্কার প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে একেবারে জড়ীভূত ভাবে, তাই 'বোধ' প্রাপ্তিতে কঠিন সমস্যা তার থেকেই যায়। বোধের জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন আছে, এই রকম ধারণা রাখার ফলেই বোধও প্রকাশিত হতে পারে না।

যদিও ভগবানের নামজপ, কীর্তন, প্রার্থনা অভ্যাসের অন্তর্গত তবুও তা অভ্যাসের চেয়েও অনেক শক্তিশালী কারণ অভ্যাসে থাকে মানুষের অহং-কেন্দ্রিক সহায়তা, কিন্তু জপ-প্রার্থনাদিতে থাকে, ভগবানের সহায়তা। 'হে প্রভু, হে আমার নাথ' এই ব্যাকুলতার ডাক অভ্যাসের থেকে অনেক বেশি তেজসম্পন্ন। অভ্যাস দ্বারা কাজ হয় নিজের উদ্যোগে আর ব্যাকুলতায় কাজ হয় ভগবানের কৃপায়। যারা অভ্যাসের গণ্ডীতেই আটকে আছে, তাদের সংস্কারে রয়েছে অভ্যাসবৃত্তি, তাই তারা যদি নামজপ, কীর্তন, প্রার্থনায় আন্তরিকভাবে সক্রিয় হয় তবে তা খুবই কার্যকরী হবে।

—— ০ ——

‘কোটিং ত্যক্ত্বা হরিং স্মরেৎ’

মনুষ্যমাত্রেরই মুখ্য প্রয়োজন—নিজের জীবনের একটি উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য পূর্বনির্ধারিতই রয়েছে। ভগবান জীবকে মনুষ্যশরীর দিয়েছেন, যাতে চিরতরে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সে আত্মদর্শন করতে পারে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই জীব মনুষ্যদেহ ধারণ করে আর এইজন্যই ভগবানকে পাওয়ার মধ্য দিয়েই ঘটে মনুষ্যজন্মের প্রকৃত সার্থকতা। এই কার্যসাধনের নিমিত্তে মনুষ্যশরীর ছাড়া আর কোনো শরীরই যোগ্য নয়। যদিও ভগবানের দিক থেকে কারোর ক্ষেত্রেই কোনো বাধা নেই, কিন্তু একমাত্র ভগবদপ্রাপ্তির জন্যই মনুষ্যশরীর গঠিত। এমন মনুষ্যশরীর পেয়েও যদি কেউ নিজের উদ্দেশ্য ঠিকমতো না নির্ধারিত করতে পারে, তাহলে আর সে করলোটা কী ? এইজন্যই সকল ভ্রাতা-ভগ্নীকে অনুরোধ করি তারা যেন নিজের উদ্দেশ্যরূপে, ‘আমাকে ভগবদপ্রাপ্তি করতেই হবে’—এই কথা স্বীকার করে নেয়। তারা আমার কথা মেনে নিক বা গীতা, কিংবা রামায়ণ আদি গ্রন্থের নির্দেশ মেনে নিক এইগুলির সবেতে এই মূল কথাই ঘোষিত হয়েছে যে, ‘ভগবদপ্রাপ্তির জন্যই মনুষ্যজন্ম লাভ হয়।’ ভগবদপ্রাপ্তি ছাড়া মনুষ্যজন্মের আর অন্য কোনো প্রয়োজন নেই। ভগবদপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে মনুষ্যশরীর চুরাশী লক্ষ প্রজাতি সমূহের সকল জীব-শরীরের মতোই প্রতিপন্ন হয়। এই কারণে মনুষ্যজন্মের মূল্যটা বুঝতে হবে। বিচার করতে হবে, মনুষ্যজন্ম কেন হয়েছে ? ভগবান কেন তা দিয়েছেন ? কেন আমি এই শরীর পেয়েছি ? পরমাত্মপ্রাপ্তি ছাড়া মনুষ্যজন্মের অন্য কী প্রয়োজন থাকতে পারে ?

মনুষ্যজন্মই একমাত্র সেইরকম, যার দ্বারা মানুষ চিরতরে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে—

সাধন ধাম মোচ্ছ কর দ্বারা। পাই ন জেহি পরলোক সঁবারা॥
সো পরত্র দুখ পাবই সির ধুনি ধুনি পছিতাই।

কালহি কর্মহি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোস লগাই॥
(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৩)

এমন শরীর পেয়েও যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি না করা হয় তাহলে আর কী করা হল ? আধ্যাত্মিক তত্ত্বলাভের জন্যই মনুষ্যজন্ম লাভ হয়েছে, এ ছাড়া মনুষ্যজন্মের আর কী কাঙ্ক্ষিত থাকতে পারে ? যদি এটাই সম্ভব না হল তো মানুষ হওয়ার কারণটা কী ? মানুষ আর পোকা-মাকড়ে তফাৎটা রইল কোথায় ? মনুষ্যজন্মের সার্থকতাই বা কী হল ? পরমাত্মপ্রাপ্তির বিষয়ে যদি মানুষ দৃঢ়ভাবে সক্রিয় না হয় তো সে আর কী করলো ? কোন উদ্দেশ্য সফল হল ? ভ্রাতা বা ভগ্নীরা যদি পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যই না রাখে তো তাদের মনুষ্যজন্মের হেতুটা কী ? নীতি-পুস্তকে একটি শ্লোক আছে—

শতং বিহায় ভোক্তব্যং সহস্রং স্নানমাচরেৎ।
লক্ষং বিহায় দাতব্যং কোটিং ত্যক্ত্বা হরিং স্মরেৎ॥

'শতকার্য বাদ দিয়ে ভোজন করো, সহস্র কার্য ছেড়ে দিয়ে স্নান করো, লক্ষ কার্য সরিয়ে দিয়ে দান করো, আর কোটি কার্য ত্যাগ করে ভগবানকে স্মরণ করো।'

অর্থাৎ কোটি কার্যও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো হোক, ওগুলি ছেড়ে ভগবানকে স্মরণ করো। ভগবানকে স্মরণ করাই সবকিছুর থেকে বেশি প্রয়োজনীয়। ভোজনের থেকে, স্নানের থেকে, এমনকি দানের থেকেও বড় হল ভগবানকে স্মরণ করা। ভগবানকে স্মরণ ছাড়া জন্ম-মৃত্যুর থেকে অব্যাহতি নেই। জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনী থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যজন্ম আর কোন্ কাজে লাগবে ? লোকে সৎসঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে 'আমার এই এই কাজ করার আছে, তাই যেতেই হবে।' আবার কারোর আসতে দেরি হলে সে উত্তর করে 'অনেক কাজ এসে গেছিল, তা না হলে আমি আরও আগে আসতাম।' এর দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, সৎসঙ্গ থেকেও অন্যান্য কাজ তার কাছে অধিক অভিপ্রেত। শাস্ত্রে আছে, **'কোটিং ত্যক্ত্বা হরিং স্মরেৎ'**, 'কোটি কার্য ছেড়েও ভগবানকে স্মরণ করো।' এইভাবে আপনি কি কখনো ভগবানকে

স্মরণ করেছেন ? বিবেচনা করে দেখতে হয়, পারমার্থিক উন্নতিকল্পে আমরা কটা কাজ ছেড়েছি। কটা কাজকেই বা উপেক্ষা করতে পেরেছি ! নিজের হৃদয়ের ওপর হাত রেখে নিজেকে ভাবতে হবে, আমি পারমার্থিক বাণীকে কতটা সমাদর করেছি। লোকে বলে, 'আমরা সৎসঙ্গ করি, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি চাই', কিন্তু নিজের লক্ষ্যকে ঠিকমতো পৌঁছনোর জন্য মানুষ কি যথাযথ সচেষ্ট হচ্ছে ? তার জন্য কি তার আগ্রহ সত্যিই আছে ? নজর করলেই বোঝা যাবে সে প্রকৃতপক্ষে কি চায় ! 'পরমাত্মপ্রাপ্তি কিছুতেই হচ্ছে না' এমন কথা অনেকেই বলে থাকে, কিন্তু সেই প্রয়োজনে তারা কতটা অন্য কার্য ত্যাগ করেছে সেটাই হল প্রশ্ন !

এই মনুষ্যজন্মেই পরমাত্মপ্রাপ্তি হতে পারে। কারণ এই উদ্দেশ্যেই এই মনুষ্যজন্ম লাভ হয়েছে। কিন্তু এই কাজে মানুষ কতটা তৎপর হয়েছে, সেদিকে তার লক্ষ্য রাখা কর্তব্য ; অন্তরে সেটা বিচার করে দেখা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে আছে, কোটিসংখ্যক কাজও যদি এদিক ওদিক হয়ে যায় যাক, তবুও ভগবানের স্মরণ ছাড়তে নেই। ভগবানকে স্মরণ করায় একজন মানুষ কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন ? এ ব্যাপারে তিনি কতটা সক্রিয় হয়েছেন তা নিজেই বিচার করে দেখুন। তবেই তিনি ধরতে পারবেন তাঁর নিজের কতখানি আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে ? প্রত্যেক সাধকেরই এইভাবে বিচার করা উচিত। যদি সব কাজ ছেড়ে ভগবানকে স্মরণ করাকেই কেউ গুরুত্ব দিয়ে থাকে তবে সে কখনো বলবে না যে, 'আমার এত বছর চলে গেল, কিন্তু পরমাত্মপ্রাপ্তি তো হল না।' কেউ ভগবানকে যতখানি আন্তরিকভাবে বরণ করে, তাকে তার থেকেও অনেক বেশি কৃপা করেন ভগবান।

প্রশ্ন—তাহলে কি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করে ভজন করা উচিত ?

উত্তর—শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা, আত্মীয়-স্বজনকে পালন করা, ন্যায়সঙ্গত কার্যসাধন করা তো খুবই ভালো, কিন্তু ভগবদ-স্মরণের সামনে এ সমস্ত কাজই গৌণ হয়ে যায়। এর অর্থ এই নয় যে, কর্তব্যকর্ম সব ছেড়ে

দিতে হবে। কর্তব্যকর্ম নিশ্চয়ই করতে হবে কিন্তু ভগবদ-স্মরণকে দিতে হবে সর্বাধিক গুরুত্ব। জগৎ-সংসারের যা কিছু কাজ, তা সমস্তই একদিন চলে যাবে, কিন্তু ভগবানের প্রতি নিবেদিত স্মরণাদি কখনোই বিফলে যাবে না। সাংসারিক ব্যাপারে যতই উন্নয়ন করা হোক না কেন, তা কখনো অটুট হতে পারে না। উন্নতি যদি হয়ও নষ্টও হবে, আর খারাপ দশা যদি আগে থেকেই থাকে তো কথাই নেই, সে তো নষ্ট হয়েই আছে। আসলে সাংসারিক ব্যাপার মাত্রই তো ভাঙ্গনধর্মী। মনুষ্যজন্মের সার্থকতা ভগবদপ্রাপ্তিতেই। ভোজনে বা স্নানে কিংবা দানের মাধ্যমে মনুষ্যজন্মের সফলতা আসে না, তার সাফল্য ঘটে ভগবদস্মরণে। প্রত্যেকের নিজেরই ভেবে দেখা উচিত, ভগবানকে স্মরণ করার থেকে বড় কাজ কি আর কিছু আছে!

সমস্ত কর্তব্যের মধ্যে মুখ্য হল, ভগবানকে স্মরণ করা। অন্য সব কর্তব্য এর থেকে নিম্নস্থানীয়। বলার সময় মানুষ কর্তব্য-কর্মের চাপের কথা শোনায় বটে, কিন্তু আসলে ওসবের দোহাই দিয়ে শুধু আয়ুক্ষয়ই করে। কিন্তু এই কথাগুলি শুধু পড়ে বা শুনে বোঝা যাবে না। কেউ যখন নিজে ব্যাপারটা মনন করবে তখনই সে বুঝতে পারবে। **'কোটিং ত্যক্ত্বা হরিং স্মরেৎ'**—এই বাক্যটি অযথা বলা একটি কথার কথা মাত্র নয়।

প্রকৃত কর্তব্য হল তাই, যার দ্বারা মানুষ সাংসারিক স্তরের চেয়ে উচ্চভূমিতে সচেতন হতে পারে। কর্মযোগের দ্বারা মানুষ সংসার থেকে উত্তরণ পেতে পারে। অর্থাৎ যদি কারও সংসার থেকে উত্তরণ হয় তবেই সে তার কর্তব্যপালন করলো, তা না হলে বলতে হয় যে, সে তার কর্তব্যটা বুঝতেই পারেনি, শুধু সময়ই নষ্ট করেছে। কর্তব্য-কর্ম ঠিকমতো পালন করলে তো স্ত্রী-পুত্র বা টাকা-পয়সায় তার মনই যেতো না ; টাকার জন্য সে মিথ্যা, কপটতা, প্রবঞ্চনা বা চালাকীর আশ্রয় নিত না। কর্তব্য-কর্ম পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ সংসারের থেকে উত্তরণ পায় এবং প্রকৃত শান্তিলাভ করে, এটাই নিয়ম—

বিহায় কামান্যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

(গীতা ২।৭১)

'যে মানুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করে স্পৃহাহীন, মমতা-শূন্য, এবং নিরহঙ্কার হয়ে আচরণ করে, সে শান্তিলাভ করে।'

প্রশ্ন—যদি কারোর অসুখ হয় তো তাকে সেবা না করে কি ভগবানকে ভজন করা উচিত ?

উত্তর—যদি ভগবানকে সেবা করার মানসিকতা নিয়ে অসুস্থের সেবা করা যায় তো অসুবিধাটা কী ? বাধাটা কোথায় ? অসুস্থকে সাক্ষাৎ ভগবান মনে করে তার সেবা করা যায়। সংসারের কাজ ভগবানের কাজ মনে করে করতে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

(গীতা ৯।২৭)

'হে কুন্তীপুত্র ! তুমি যা কিছু করো, যা কিছু ভোজন করো, যে সকল যজ্ঞ করো, যে সমস্ত দান করো এবং যে তপস্যা করো—সব আমার প্রতি অর্পণ করে দাও।'

ভগবানের কাজ মনে করে যদি সকল কাজ করতে পারো তো সে সমস্তই 'ভজনা' হয়ে যাবে। শৌচ, স্নান-কার্য পর্যন্ত ভগবানের সেবা। সন্তান যদি তৃপ্তি সহকারে ভোজন করে নেয় তো মা তাতে প্রসন্ন হন। ভগবান কি মায়ের থেকেও কম দয়ালু ? একনাথ মহারাজ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের টীকায় লিখেছেন যে, ঘর পরিষ্কার করে সেই আবর্জনা বাইরে ফেলে দেওয়ার কাজকেও ভগবানের কাজ রূপে ভাবলে সেটাও 'ভজন' হয়ে যাবে। কারোর যদি ভগবদপ্রাপ্তির দৃঢ় উদ্দেশ্য থাকে তো তার সব কাজই ভজনে পরিণত হবে। তাহলে তো তার কাজ আর সংসারের কাজ থাকবে না, বস্তুত প্রত্যেকটি কাজই ভগবানের কাজ হয়ে যাবে। এতেই হবে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

—— ০ ——

নিত্যপ্রাপ্তকে প্রাপ্তি

ভগবান জীবকে মানব-শরীর দিয়েছেন যাতে সে নিজের কল্যাণসাধন করতে পারে। এই দৃষ্টিতে মানব-প্রজাতি প্রকৃতপক্ষে সাধন-প্রজাতি। সাধন-প্রজাতি হওয়ায় মানুষ মাত্রই নিজের কল্যাণসাধন করতে পারে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। কেন পারে ? কারণ প্রকৃত বিচারে সে মুক্তই। এইজন্য সাধকের সবার আগে এই সত্যটিকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, 'আমি অবশ্যই মুক্ত হতে পারি। কেন পারি ? কারণ আমি মুক্ত আছিই। আমি পরমাত্মাকে লাভ করতে পারি। কেন পারি ? কারণ পরমাত্মাকে আমি পেয়েই আছি। যিনি সব স্থানে, সব কালে, সর্বদা আছেন, সকল মানুষের মধ্যে আছেন, সব বস্তুতে, সব অবস্থায়, সব ঘটনায়, সব পরিস্থিতিতে নিত্য বর্তমান, সেই পরমাত্মা কি কখনো আমার থেকে আলাদা হতে পারেন ? পরমাত্মা যেমন আমার থেকে কখনো আলাদা হতে পারেন না, সেরকমই শরীরের সঙ্গেও আমার কখনো মিলনও হতে পারে না। এখন পর্যন্ত আমি বহু প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করেছি, বহু শরীর ধারণ করেছি, কিন্তু কোনো শরীরই আমার সঙ্গে থেকে যায়নি, অথচ আমি স্বয়ং যেমন তেমনই রয়ে গেছি।' তাই সাধককে এই সত্যটি স্বীকার করে নিতে হবে যে, 'পরমাত্মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং সংসারের সাথে শরীরের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। এই কারণে আমি শরীরের দ্বারা নিজের জন্য কিছুই করতে পারি না। শরীর দ্বারা যে কাজই করি না কেন তা সংসারেরই প্রয়োজনের কাজ হবে, আমার নয়। ক্রিয়ামাত্রেরই সম্বন্ধ জগৎ-সংসারকে নিয়েই। আমার স্বরূপ নিষ্ক্রিয়। যদি আমি কোনো ক্রিয়াই না করি তো শরীরের প্রয়োজনটা কী ?'

এখন সাধককে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, 'আমি যখন শরীর দ্বারা নিজের জন্য কিছুই করতে পারি না, যা কিছু করতে পারি শুধু সংসারের জন্যই, তাহলে আমার নিজের জন্য আমি কী করতে পারি ?

কেমন ভাবেই বা পারি ? বিচার করলে বোঝা যায় যে, আমি নিজের জন্য নিজের দ্বারা নিষ্কাম হতে পারি। কেন হতে পারি ? কারণ 'আমি' নিষ্কাম। আমি নিজের জন্য মমতাহীন হতে পারি। কেন হতে পারি ? কারণ 'আমি' নির্মম। আমি নিজের জন্য নিরহঙ্কার হতে পারি। কেন হতে পারি ? কারণ আমি নিরহঙ্কার। গীতায় ভগবানও আমাদের নিষ্কাম, নির্মম ও নিরহঙ্কার হওয়ার জন্য বলেছেন।[১]' কেন বলেছেন ? কারণ 'আমি' স্বরূপত নিষ্কাম, নির্মম, তথা নিরহঙ্কার আছিই।

আমি নিজেই ভগবানকে নিজের বলে মেনে নিতে পারি। কেন পারি ? কারণ ভগবান আমার আপন, নিজের। দ্বিতীয় কেউই আপন তো নয়ই, হতেও পারে না। আমি নিজের দ্বারাই সাংসারিকতা থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারি। কেন পারি ? কারণ আমি সংসার থেকে তো পৃথক সত্তাই— **'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। এর তাৎপর্য হল, আমি আত্মগত ভাবে নিষ্কাম, নির্মম, নিরহঙ্কার হতে পারি এবং তা এখনই হওয়া সম্ভব। এইরকম হওয়ার জন্য শরীরের আবশ্যকতা নেই, বস্তুত নিজের দ্বারা আত্মিকভাবেই তা সম্ভব। 'পরিশ্রম ও পরাশ্রয়' ছেড়ে দিয়ে আমি আত্মিক ভাবেই 'বিশ্রাম ও ভগবদাশ্রয়' পেতে পারি। এই ব্যাপারে আমি পরাধীন নই, বস্তুত সর্বতোভাবেই স্বাধীন।

শরীরের সাথে আমার কখনোই সম্বন্ধ ছিল না, এখনও নেই, পরেও হবে না, প্রকৃতপক্ষে হওয়া সম্ভবই নয়। যদিও শরীরের দ্বারা আমি 'ভোজন' করতে পারি বটে কিন্তু 'ভজন' করতে পারি না। শরীরের দ্বারা সেবাও করতে পারি না, কিন্তু শরীরের থেকে আলাদা হয়ে করতে পারি ! কেমন করে করতে পারি ? নিজেকে দোষমুক্ত রেখে করতে পারি। কেন পারি ? কারণ আমি দোষশূন্য—**'চেতন অমল সহজ সুখ রাসী॥'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।২)। আমি নিজের দ্বারাই ভজনও

[১]বিহায় কামান্যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ (গীতা ২।৭১)

করতে পারি। কেমনভাবে পারি ? ভগবানকে ভালোবেসেই তা করতে পারি। কেন করতে পারি ? কারণ তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধই ভালোবাসার। শরীরের দ্বারা আমি সেবা ও ভালোবাসার চর্চা তো অবশ্যই করতে পারি কিন্তু সেবা ও ভালবাসতে পারি না।

সংসার থেকে পাওয়া শরীর-ইন্দ্রিয়সমূহ-মন-বুদ্ধির দ্বারা আমি সংসারকেই লাভ করতে পারি কিন্তু পরমাত্মাকে পারি না। পরমাত্মাকে না যায় শরীর দিয়ে ধরা, না যায় ইন্দ্রিয়সমূহ বা মন কিংবা বুদ্ধি দিয়ে ধরা। যদি এইগুলির দ্বারা পরমাত্মাকে ধরা যেতো তাহলে তো কোনো যন্ত্রের সাহায্যেও তাঁকে ধরা যেত । এইজন্যই যদি সাধক পরমাত্মাকে লাভ করতে চান তাহলে তাঁর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে, ক্রিয়ার আশ্রয়ও ত্যাগ করতে হবে। এই দেহাদি জড় বস্তুর দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্ভব নয়, এগুলিকে ত্যাগের (সম্বন্ধ বিচ্ছেদের) দ্বারাই তা সম্ভব। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে অন্যদের হিতে (সেবায়) ব্যবহার করে নিশ্চয়ই 'ভালোমানুষ' হওয়া যায়, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমিক হওয়া যায় না। অথচ তা হওয়া যায় নিজের দ্বারাই অর্থাৎ আত্মিকভাবেই। এর দ্বারা এইটিই প্রতিপন্ন হয় যে, পরমাত্মাকে পেতে হলে, তাঁর অনুরাগী হতে গেলে শরীরের তো নেই-ই—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিরও আবশ্যকতা নেই। শরীরের দ্বারা যে বস্তু পাওয়া যায় তা সকলে নাও পেতে পারেন, কিন্তু নিজে থেকে প্রাপ্তব্য বস্তু (পরমাত্মা) সকলেই পেতে পারেন। যা কেউ পেতে পারে, আবার কেউ পারে না, সেটি পরমাত্মা নয়। পরমাত্মা সেই সত্তাই, যা সবার পক্ষেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। কেন পাওয়া সম্ভব ? কারণ তিনি প্রাপ্ত হয়েই আছেন। পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছু যখন নেই-ই, তাহলে আর সেই পরমাত্মা অপ্রাপ্ত থাকেন কী করে ?

—— ০ ——

বহুত্বের মাঝে একত্ব

এক হল অপরা প্রকৃতি (জগৎ), আরেক হল পরা প্রকৃতি (জীব), আর এই দুটির প্রভু হলেন পরমাত্মা। সকল শরীর ও সংসার হল 'অপরা'র অন্তর্গত আর জীবসমূহ হল 'পরা'র অন্তর্গত। সকল শরীরও আসলে এক। সকল জীবও এক, এবং এই পরা ও অপরা যাঁর শক্তি, তিনিও এক— **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।২।১)। তাই শরীরের দিক থেকে, জীব(আত্মা)-এর দিক থেকে তথা পরমাত্মার দিক থেকে—তিন দিক থেকেই আমরা সব এক অর্থাৎ অনেক বা বহু নয়। কিন্তু মানুষ সামগ্রিকভাবে এই একত্ব না মেনে যখন বস্তুসমূহে আপন ও পর—এই ভেদবোধের জন্ম দেয়, তখনই তার জীবনে দোষ দেখা দিতে থাকে। যেমন, কৌরব ও পাণ্ডবদের ভাই-এর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যখন ধৃতরাষ্ট্রের মনে 'মামকাঃ' (আমার পুত্র) আর 'পাণ্ডবাঃ' (পাণ্ডুর পুত্র)—এই শব্দ দ্বয়ের মাধ্যমে ভেদসূচক ভাব জাগলো, তখনই তাঁর জীবনে নেমে এলো দুর্দশা, যার পরিণতিতে ঘটেছিল মহাভারতের মহাযুদ্ধ। এইজন্য দোষমুক্ত হতে গেলে সাধককে দৃঢ়তার সঙ্গে এই সত্যটি মেনে নিতে হবে যে, বাহ্যত যতই বহুত্বের প্রকাশ থাক, প্রকৃতপক্ষে আমরা সব এক—শরীরের দিক থেকেও এক, আত্মার দিক থেকেও এক, পরমাত্মার দিক থেকে এক তো বটেই। সমস্ত শরীরই পঞ্চমহাভূতের উপাদানে গঠিত, সুতরাং এগুলি মূলে সব এক। সমস্ত জীবই পরমাত্মার অংশ, তাই তারা সবাই এক ; মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপে যাঁর উপাসনা করে সেই পরমাত্মাও এক।

প্রকৃত ভক্ত হতে পারে সে-ই যে কাউকেই পর বলে তো মনে করেই না, বরং সবাইকে নিজের বলে বোঝে এবং সবার সেবা করে।[১] সেবা করার দিক থেকে সবাই আপন, কিন্তু নিজের জন্য আছেন কেবল পরমাত্মাই। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইতাদি যা কিছু আমার বলে কথিত,

---

[১]আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ (গীতা ৬।৩২)

'হে অর্জুন ! যে ভক্ত নিজ দেহের উপমায় সর্বত্র আমাকে সমভাবে দেখে এবং সুখ ও দুঃখকেও সমত্বে দেখে, সে-ই পরম যোগী রূপে মান্য।'

এই সবই সংসারের তথা সংসার থেকেই পাওয়া। কিন্তু নিজের বস্তু সেটাই হতে পারে যা সর্বদাই আমার সাথে আছে। এমন বস্তু তো একমাত্র পরমাত্মাই।

প্রকৃত সেবা হল, কারোর ক্ষতি না করা। যে কখনো কারোর অনিষ্ট করে না, তার দ্বারা বিশ্বের সেবা সংঘটিত হয়। কারণ কারোর অনিষ্ট না করায় তার ব্যক্তিত্বের গণ্ডী ভেঙ্গে যায় এবং তার আত্মিক সম্বন্ধ ঘটে সর্বব্যাপী অসীম তত্ত্বের সাথে। যার দ্বারা কখনো কারোর খারাপ কিছু হয়নি, সে নিজেও খারাপ থাকতে পারে না, বরং ভালো থাকে। মানুষ ভালো কাজ করলেই ভালো হয় না, খারাপকে সর্বতোভাবে বর্জন করলেই প্রকৃত ভালো হয়। কারণ ভালো কাজ করাটা একটা সীমিত ব্যাপার, কিন্তু কখনো কারোর অনিষ্ট না করার ভাবটা অসীম। অসীম ভাবের দ্বারা অসীমতত্ত্বের প্রাপ্তি ঘটে। এইজন্য সবচেয়ে বড় সেবা হল—'খারাপ' ভাবকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা। যে মানুষ 'খারাপ'-কে ত্যাগ করতে পেরেছে, সেই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ মানুষ।

'খারাপ'-কে ত্যাগের জন্য মানুষের আবশ্যক হল, কারোর কাছেই কিছু না চাওয়া ; সংসারের কাছেও না, পরমাত্মার কাছেও না। কেন সে চাইবে না ? কারণ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একটি কেশাগ্র পর্যন্ত কারোর নিজের নয়। জপ-তপ, ব্রত, তীর্থযাত্রা আদি পালনেও কামনার বিনাশ হয় না। সেটি সম্ভব হয়, যখন মানুষ এই সত্যটিকে স্বীকার করে নিতে পারে যে, কোনো কিছুই তার নয়। যে বস্তু আমার নয়, তা আমার জন্যও হতে পারে না। যার ওপর আমার স্বতন্ত্র অধিকার প্রযোজ্য নয়, যা সর্বদা আমার সঙ্গে থাকতে পারে না, যা প্রাপ্ত হলেও আমার অভাব মেটে না, সেই বিষয়টি আমার কিংবা আমার জন্য কী করে হতে পারে ?

সামগ্রিক ভাবে জগৎ-সংসার এক। এর মাঝে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও সীমানার ভাগ দেখা যায়, তা কৃত হয়েছে মানুষের দ্বারা বিভাজনে। মানুষ নিজের স্বার্থে বশীভূত হয়ে একক জগতের মাঝেই বহু ভেদের সৃষ্টি করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সৃষ্টি এক এবং তার স্রষ্টা পরমাত্মাও অদ্বিতীয় এক। যে সংসারকে জানে এবং পরমাত্মাকে মান্য করে সেই মানুষও একই। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি (অপরা) এবং জীব (পরা)-এরও স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

স্বাতন্ত্র্য আছে একমাত্র পরমাত্মারই। জগৎকে ধারণ করে আছে জীবই—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫) অর্থাৎ জগৎকে সত্তাবান করেছে জীবই, এইজন্যই জগতের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীব হল পরমাত্মার অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭), এই কারণে জীবের পর্যন্ত স্বতন্ত্র সত্তা নেই। অর্থাৎ, জগতের সত্তা জীবের অধীনে এবং জীবের সত্তা পরমাত্মার অধীনে। এইজন্য, এক পরমাত্মা ব্যতীত আর অন্য কিছু নেই-ই। জগৎ এবং জীব দুই-ই আভাসিত হয়ে আছে পরমাত্মার মাঝেই।

সংসারের সাথে জীবের সম্বন্ধ কৃত্রিম আর পরমাত্মার সাথে জীবের সম্বন্ধ প্রকৃত। যার সাথে সম্বন্ধ জীবের গড়ে তোলা, তাকে সেবা করতে হবে আর যার সাথে তার সম্বন্ধ অকৃত্রিম তাকে ভালোবাসতে হবে। সংসারের কাছেও চাওয়ার কিছু নেই, চাওয়ার কিছু নেই পরমাত্মার কাছেও। সেবা ও অনুরাগ হল সাধকের স্ব-ভাব। সাধক যখন পরমাত্মাকে সংসাররূপে দেখে, তখন সে তার আন্তরিক সেবা করে আর যখন পরমাত্মারূপেই দেখে তখন হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু সাধক একমাত্র তখনই প্রকৃত সেবক হতে পারে যখন সে এই সত্যকে স্বীকার করে নেয় যে 'আমার কিছুই নেই, আমার কোনো চাহিদা বা দাবিও নেই।' এবং প্রকৃত প্রেমী তখনই হতে পারে, যখন সে এই সত্যকে মেনে নেয় যে, একমাত্র ভগবানই তার নিজের।

সাধক যদি যথার্থ বিবেচনাপূর্বক বিচার করে তবে সে নিজের মধ্যেই জগৎ-সংসারকে দেখতে পাবে এবং নিজেকে দেখতে পাবে পরমাত্মার মাঝে। জগৎ-সংসার তো প্রতিক্ষণেই পরিবর্তনশীল, সৃষ্টি হচ্ছে লয়ও হচ্ছে, কিন্তু পরমাত্মার কোনো পরিবর্তন নেই। যা পরিবর্তিত হয় তার নিজস্ব সত্তা হতে পারে না, আর যার পরিবর্তন হয় না, তা-ই হয় তার নিজস্ব সত্তা বা অস্তিত্ব—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। যখন সাধক সর্বতোভাবে দোষ-হীন হয়ে যায় তখন তার দৃষ্টিবোধে পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। ফলে সে কখনো পরমাত্মার থেকে দূরে তো থাকেই না, তার আর ভেদও থাকে না, ভিন্নতাও না। এই দশাটিই গীতায় **'বাসুদেব সর্বম্'** (৭।১৯) বাক্য দ্বারা উক্ত হয়েছে।

———— ০ ————

অর্থের নির্ভরতায় হানি

মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল নিজের জীবনের এই উদ্দেশ্যটি স্থির করে নেওয়া যে, এই জীবনেই পরমাত্মাকে লাভ করতে হবে। 'যদি সমগ্র জগৎও আমার বিরোধিতা করে, তাহলেও আমাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হবেই'—এই রকম দৃঢ় সংকল্প ছাড়া সংসার বন্ধন ছিন্ন করার উপায় নেই। নিজের উদ্দেশ্য বা ধ্যেয়টি ঠিক নির্দিষ্ট হয়ে গেলে, দেখা যাবে সবই ঠিক হয়ে যাবে। যিনি ভর্তাহীনা হয়েছেন বা যিনি বৈরাগী হয়ে গেছেন, তাঁর তো সর্বদাই পরমাত্মার লক্ষ্যে সক্রিয় হওয়া উচিত। সংসারে তাঁর আর কী করার আছে ? তাঁর শরীর-নির্বাহ ঠিকই হয়ে যাবে। কেমন ভাবে হবে, তা অবশ্য ভগবানই জানেন।

আপনারা ভেবে রেখেছেন যে আগে নিজেদের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা করে নিই, অর্থ সঞ্চয় করে নিই পরে সাধন-ভজন করা যাবে—এই মনোভাবই আপনাদের উন্নতি হতে দেবে না। যে ব্যক্তি নিজের কাছে অর্থ জমিয়ে রেখেছে, তার পক্ষে অবিলম্বে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ তার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বাধা দেবে। যার কিছুই নেই, সে কোথায় একটুকরো রুটি পাবে তারই ঠিক নেই, তার পক্ষে যত তাড়াতাড়ি আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব, তত তাড়াতাড়ি অর্থ সঞ্চয়কারী সাধকের পক্ষে হওয়া সম্ভব না। কারণ এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মধ্যে রয়েছে আর্থিক-নির্ভরতার বোধ। অর্থের প্রতি নির্ভরতায় কল্যাণ প্রাপ্তি হয় না—এটা নিশ্চিত। যার মধ্যে অর্থাদি ব্যাপারে কোনো নির্ভরতা নেই, খাবার জন্য একটু রুটির ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই, আগামীকাল কী হবে তার কোনো ঠিক নেই, এমন ব্যক্তির উন্নতি খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে। এই কথা আপনাদের যদি ঠিক নাও মনে হয়, আমি কিন্তু তাই মনে করি। যার অর্থের ওপর এমন নির্ভরতার বোধ আছে যে, অর্থ সঞ্চয় করে তার সুদে সে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করবে তার শীঘ্র উন্নতি হতে পারে না। অর্থের আশ্রয়ে

থাকলে ভগবানের অনন্য আশ্রয়টি লাভ করা যায় না। অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভরতা থাকলেই, সেটি পরমাত্মাকে প্রাপ্তির পথে বিঘ্ন ঘটাবে। প্রথমে মনে হয় যে, অর্থের ব্যবস্থা ঠিকমতো হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে সাধন-ভজন করা যাবে, কিন্তু আসলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

ভগবান বলেছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

(গীতা ৮।১৪)

'হে পৃথানন্দন ! অনন্য চিত্তে যে মানুষ আমাকে নিত্য নিরন্তর স্মরণ করে, আমার সঙ্গে নিত্য-যুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি অবশ্যই সুলভ।'

এখানে ভগবান তিনটি কথা বলেছেন, **'অনন্যচেতাঃ'**, **'সততম্'** ও **'নিত্যশঃ'**। এই তিনটি কথার তাৎপর্য হল—(১) 'অনন্যচেতাঃ', অর্থাৎ একমাত্র ভগবান ব্যতীত যার অন্য কিছুতে নির্ভরতা নেই ; (২) 'সততম্', অর্থাৎ যখন হতে পরমাত্মার সাধনে রত হয়েছে তখন থেকে মৃত্যু অবধি ; (৩) 'নিত্যশঃ', অর্থাৎ সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত—ঘুম ভাঙ্গা থেকে ঘুমিয়ে পড়ার সময় অবধি পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকা। এই তিনটির দ্বারা ভগবান সুলভ হয়ে যান। যার একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কোনো কিছুতে নির্ভরতা নেই, এমন অনন্যচেতা মানুষের জন্যই ভগবান নিজেকে সুলভ বলেছেন। যার খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি কোনো কিছুর ওপর নির্ভরতা নেই, সে যদি ভগবানের শরণাগত হয় তো খুবই তাড়াতাড়ি সে উন্নতি লাভ করবে। কেউ কেউ বলে যে, তার কাছে অর্থ নেই, যদি অর্থ থাকতো তবে সে সাধন-ভজন করতো। এসব একদম বাজে কথা। অর্থের ওপর নির্ভরতা আপাতভাবে ভালো লাগলেও, পরিণামে মোটেই ভালো নয়। যার কাছে কিছুই নেই, কোনো কিছুর সহায়তাই যার লভ্য নয়, তার ওপর ভগবানের অনেক কৃপা আছে বুঝতে হবে। সে খুবই ভাগ্যবান। তার খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে।

অসৎ বিষয়কেন্দ্রিক নির্ভরতার ফলেই সবার অনিষ্ট হচ্ছে। সেইজন্যই আধ্যাত্মিক উন্নতিও সম্ভব হচ্ছে না। যে ব্যক্তি অসৎ, অনিত্য বস্তুর আশ্রয় নেয় না, তার উন্নতি অবধারিত। যদি নির্ভরই করতে হয় তো নিত্য সত্তার ওপরই করা উচিত। অনিত্য বিষয়ের ওপর নির্ভরতা আপাতভাবে ঠিক মনে হলেও আসলে কোনো লাভ হয় না। 'অর্থ সঞ্চিত হলে, তার সুদও আসবে, ঐ সুদের অর্থে কাজ চলবে এবং নিশ্চিন্তে সাধন-ভজন করবো'—এই হল অসতের ওপর নির্ভরতার ভাব। যদি কেউ আধ্যাত্মিক উন্নতি চায় তো তার অবশ্যই অনিত্য বিষয়ের ওপর নির্ভরতা ছাড়তে হবে। তা করতে পারলে উন্নতি অবশ্যই হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। এইজন্যই কোনো কিছুর সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে নেই, তা সে কোনো বস্তুই হোক বা ব্যক্তিই হোক। সৎ-সঙ্গ থেকে শিক্ষা নেওয়া ভালো। কিন্তু তার ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। গুরুর সাহায্যের ওপর পর্যন্ত নির্ভর করতে নেই। শ্রীদয়ালুদাস মহারাজ বলেছেন—

বোল ন জাণূঁ কোয় অল্প বুদ্ধি মন বেগ তেঁ।
নহিঁ জাকে হরি হোয় যা তো মৈঁ জাণূঁ সদা॥

(করুণাসাগর ৭৪)

অর্থাৎ, যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। কিন্তু যে মনে করে, 'আমার কাছে অনেক অর্থ হলে আমিও সাধন-ভজন করবো' সে ভজনাদি করতেই পারে না। সংসারে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যারা অর্থবান, তারা কেমন সাধন-ভজন করে থাকে! ধনী ব্যক্তি সৎ-সঙ্গ করতে পারে না, যদি-বা উপস্থিত হয়, বেশিক্ষণ সময় দিতে পারে না। আমি এমন অনেক ব্যক্তি দেখেছি, যারা সৎসঙ্গ করত। কিন্তু যেই তারা যথেষ্ট অর্থবান হয়ে গেল, তাদের সৎ-সঙ্গে যোগদানও বন্ধ হল! সংসারের ওপর নির্ভরতা, কোনো কাজের নয়। যার কাছে কিছু নেই, কোথাও নির্ভরতা নেই, সে ভগবানের খুব প্রিয় হয়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন—

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬০।১৪)

'আমি সর্বদা অকিঞ্চন আছি এবং অকিঞ্চন ব্যক্তিদেরই আমি ভালোবাসি তথা অকিঞ্চনগণই আমাকে ভালোবাসে।'

কুন্তীদেবী ভগবানকে বলেছিলেন যে, 'আপনি তাদেরই দর্শন দেন, যারা অকিঞ্চন', '**ত্বামকিঞ্চনগোচরম্**' (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।২৬)। এইজন্য যার নিজের বলে কিছু নেই, সে বড়ই ভাগ্যবান। তার ওপর ভগবানের বিশেষ কৃপা থাকে। সংসারকে নিজের বলে মনে করলে শুধু ঠকতেই হয়। সংসারে নির্ভরতা স্থায়ী হতে পারে না। তা একদিন ভেঙ্গে যাবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মনের মাঝে যদি এই নির্ভরতার ভাব এসে যায় যে, 'সঞ্চিত অর্থের সুদ আসতে থাকবে আর আমি নিশ্চন্তে সাধন-ভজন করে যাবো'—তাহলে তা অর্থেরই সাধনা হবে, ভগবানের নয়। বস্তুত তার চিন্তার কেন্দ্রে থাকবে অর্থই। যদি সংসারে নির্ভরতা ছাড়তে পারা যায়, তাহলে শুধু ভগবানেই নির্ভরতা থাকবে। কারণ অনিত্যের সঙ্গ ত্যাগ করলে নিত্যই বিদ্যমান থাকবে।

যার কাছে কিছুই নেই আর অন্তরে কোনো কামনাও নেই সে খুবই ভাগ্যবান। 'আমার কিছুই নেই, আর আমার কিছু চাই না'—এমন ভাবাবলম্বীর জীবন নির্বাহে কোনো অভাব হয় না। কুকুরদের দেখলে মনে হয় এরা যেন ঝোলাবিহীন ফকির। ওদের না আছে অর্থ, না জমি-জায়গা, না কোনো জীবিকা, কিন্তু ওদের বংশধারা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলছে। ভগবান শ্রীরামের রাজ্যেও কুকুরের কথা আছে। যার কাছে অধিক অর্থ থাকে, সে খরচও করতে পারে না। সাধুগণের আহার আসে দরিদ্রের কুটীর থেকেই, ধনীর প্রাসাদ থেকে নয়। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা। দরিদ্রের গৃহে রান্নাঘরে পর্যন্ত ঢুকে পড়া যায়, কিন্তু ধনীদের গৃহে প্রবেশ পর্যন্ত করা যায় না, কারণ তার গৃহদ্বারে লাঠি হাতে প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকে। যার মুখে দেবার খাদ্যটুকু নেই, পরনের বস্ত্রটি পর্যন্ত ঠিকমতো জোটে না, নেই কোনো বাসগৃহ, হাতে নেই পয়সা, পায়ে নেই জুতো, মাথায় নেই ছাতা, আছে শুধু একমাত্র ভগবানের ওপর নির্ভরশীলতা, সে তো সাধু-

মহাত্মায় পরিণত হয়ে যাবে। 'অর্থবান হলে সাধন ভজন করবো'—এ একদম বাজে কথা। আমি ধনী লোকেদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। তাদের অনেকের কাছে এতো অর্থ আছে যে, তাদের বংশে কয়েক পুরুষ, সকলে কিছু কাজ না করে শুয়ে বসে জীবন-নির্বাহ করে যেতে পারে, তবুও তারা সারাদিন অর্থ রোজগারের জন্যই শুধু কাজ করে চলেছে। এখন এইরকম মানুষ সাধন-ভজন করবেটা কী করে ? অর্থের ওপর নির্ভরতা সাধন-ভজনে খুবই বড় বিঘ্ন ঘটায়।

সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর কাছে আমার আবেদন, আপনারা প্রত্যেকে এই উদ্দেশ্য ঠিক করে নিন যে, 'আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতেই হবে', এবং ভগবানের প্রতি 'হে নাথ, হে আমার প্রভু' সম্বোধনে তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকুন। অতি উত্তম তথা উপকারী কথা রূপে এটি মনে রাখতে হবে।

——— ০ ———

'মামেকং শরণং ব্রজ'

বেদের সার হল উপনিষদ্, আর উপনিষদের সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

'উপনিষদসমূহ যেন একটি গাভী, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেটিকে দোহন করছেন, অর্জুন হল গোবৎস, গীতারূপ মহান অমৃত তার দুগ্ধ আর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সেই দুগ্ধ পানের অধিকারী।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার হল—শরণাগতি। ভগবান এই শরণাগতিকে 'সর্বগুহ্যতম' অর্থাৎ সর্বাধিক তথা অত্যন্ত গোপনীয় বলে অভিহিত করেছেন—'**সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু**' (গীতা ১৮।৬৪)। এই 'সর্বগুহ্যতম' শব্দটি গীতায় একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এমন সর্বগুহ্যতম শরণাগতির কথা ভগবান এইভাবে বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

'সকল ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে তুমি কেবল আমার শরণে এসো। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেবো, কোনো চিন্তা কোরো না।'

ভগবান কিন্তু সকল ধর্মকে বাহ্যিকরূপে ত্যাগের কথা বলেননি। যদি বাহ্যত ত্যাগের কথা বলতেন তাহলে অন্তত অর্জুন তো যুদ্ধ করতেন না ; কারণ যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—'**যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্**' (গীতা ১৮।৪৩), কিন্তু অর্জুন যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং ভগবানের ঐ কথা বলার তাৎপর্য হল এই যে, 'ধর্মেরও শরণ নিতে হবে না, শরণ নিতে হবে কেবল আমার।'

যখন মানুষের নিজের শক্তিহীনতা আর ভগবানের সর্বশক্তিমত্তাটা

অনুভবে ধরা পড়ে, তখন সে শরণাগত হয়ে যায়। শরণ নেওয়া মাত্রই শরণাগত ভক্তের মধ্যে ভগবদ্‌কৃপায় বিশেষ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়। ভগবানের আছে অনন্ত অপার, অসীম শক্তি, তার কোনো সীমা নেই। তাই মানুষের উচিত ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করা। গীতায় ভগবান বলেছেন—

জরামরণমোক্ষায় মামশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়ান কালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥

(৭।২৯-৩০)

'বার্ধ্যক্য ও মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে মানুষ আমার আশ্রয় নিয়ে প্রযত্ন করে, সে সেই ব্রহ্মকে, সমগ্র অধ্যাত্মতত্ত্বকে এবং সম্পূর্ণ কর্ম-তত্ত্বকে অবগত হতে পারে।'

'যে মানুষ অধিভূত ও অধিদৈব তথা অধিযজ্ঞের সাথে আমাকে জানে, আমার প্রতি সমাহিত চিত্তের সেই মানুষ প্রয়াণকালেও আমাকেই জানতে পারে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়।'

এর তাৎপর্য হল, যে প্রভুর আশ্রয় নিয়ে সাধন করে সে ব্রহ্ম, জীব, জগৎ আদি সব কিছুকেই জেনে যায় অর্থাৎ সে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে যায়। এইজন্য মানুষের উচিত তৎপরতা ও উৎসাহপূর্বক সমস্ত কাজ করা, কিন্তু ভরসা বা নির্ভরতা রাখতে হবে একমাত্র ভগবানেরই ওপর যে, তাঁর কৃপাতেই প্রকৃত কল্যাণ হবে। সাধনের ওপরও ভরসা রাখতে নেই। সাধনের ওপর ভরসা রাখলে অভিমান জাগবে এবং অভিমানের কারণে পতনও ঘটবে।

গীতায় ভগবান অর্জুনকে আজ্ঞা করেছেন—'**নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্**' (১১।৩৩)। 'হে সব্যসাচী, (অর্থাৎ দুই হাতে বান চালাতে

সক্ষম অর্জুন), তুমি (শত্রুদের আঘাত করার জন্য) নিমিত্তমাত্র হয়ে যাও।' গীতার শেষে অর্জুন ভগবানকে বলেছিলেন যে, 'আপনার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আপনি যেমন বলবেন, সেইরকমই করবো'—**'করিষ্যে বচনং তব'** (গীতা ১৮।৭৩)। পরে ভগবান যেমন বলেছেন, অর্জুন তেমনই করেছেন। যখন কর্ণের রথের চাকা জমিতে ঢুকে গেছিল এবং তিনি রথ থেকে নীচে নেমে ঐ চাকা বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করছিলেন, তখনই ভগবান অর্জুনকে বললেন, 'বাণ নিক্ষেপ করো'। অর্জুন কথাটা ঠিক ধরতে না পারলেও বাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন, কারণ ভগবান যখন নিজে আজ্ঞা করেছেন তখন আর কারণটা বোঝার প্রয়োজন নেই। কর্ণ বলেছিলেন, 'তুমি শাস্ত্র ও অস্ত্র বিদ্যা দুটোই জানো, তাহলে তুমি এমন অন্যায় কাজ করছো কেমন করে ? আমি নীচে নেমেছি এবং অন্য কাজে ব্যস্ত আছি আর তুমি বাণ নিক্ষেপ করে যাচ্ছো !' অর্জুনের হয়ে উত্তরে ভগবান বলেছিলেন আততায়ীকে মারার জন্য বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন নেই। আততায়ীকে মারলে হত্যাকারীর কোনো দোষ হয় না—এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত[১]। এই কথা শুনে অর্জুনও

[১]অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহর্তা চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ॥
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥

(বষিষ্ঠস্মৃতি ৩।১৯-২০)

'অগ্নি-সংযোগকারী, বিষ-প্রদানকারী, নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাতকারী, ধন-অপহরণকারী, জমি-বাড়ি দখলকারী এবং স্ত্রীকে হরণকারী—এই ছয় রকম ব্যক্তিকে আততায়ী বলা হয়। আততায়ী অনিষ্ট করতে এলে বিনা বিচারে তাকে নিধন করা উচিত। আততায়ীকে মারলে হত্যাকারীর কোনোরকম দোষ হয় না।'

অগ্নিদত্ত বিষদত্ত নর, ক্ষেত্র দার ধন হার
বহুরি বকারত শস্ত্র গহি, অবধ বধ্য ষটকার॥

(পাণ্ডবযশেন্দুচন্দ্রিকা ১০।১৭)

বুঝে গেলেন, কেন ভগবান এমতাবস্থায় বাণ নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এই রকমই ভগবানের চরণে আশ্রয় নিতে হয় এবং তাঁরই আজ্ঞা মনে করে কর্তব্য-কর্ম করে যেতে হয়। নিজের অভিমান ছেড়ে ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারলে তাতেই লাভ হয় সবচেয়ে শান্তিময় জীবন। শুদ্ধ হৃদয়ে ভগবানের আশ্রয় নিয়েই নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, শোকহীন থাকা যায়। সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করতে হয়, জপ-ধ্যান-ভজন করতে হয় সেইসঙ্গে অন্যদের সেবা করতে হয়, তাদের সুখী রাখতে হয়। তাহলে আর চিন্তা করার প্রয়োজন হবে না যে, 'কী হবে, কেমন করে হবে, উদ্ধার হবে কি না হবে!' অবশ্য, একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, কখনো যেন ভগবানের নির্দেশের বিরুদ্ধে সক্রিয়তা না ঘটে।

আমরা ভগবানের শরণাগত হই কী প্রকারে ? এইটি বোঝার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ধরুন কারোর ঘরে বিবাহের উপযুক্ত একটি কন্যা আছে । সে যদি কন্যার বিবাহ দিয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু কন্যাটি আর ঐ গৃহের থাকবে না। নতুন যে গৃহে সে বধূ হয়ে যাবে, সে সেই গৃহেরই হয়ে যাবে। তার গোত্রও পাল্টে যাবে। যদি তার পিত্রালয়ে কোনো অশৌচ হয় তো তার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না, কিন্তু শ্বশুরালয়ের অশৌচে সে সামিল হবে। সে তার পিত্রালয়ে জন্মেছে, সেখানেই লালিত-পালিত হয়েছে, পড়াশুনা করে বড় হয়েছে, কিন্তু বিবাহিতা হয়ে গিয়ে সে শ্বশুরালয়ের হয়ে গেছে, পিত্রালয়ের আর থাকেনি। এইরকমই ভগবানের হয়ে যেতে হয়। দৃঢ়তা সহকারে মেনে নিতে হবে যে, 'এখন আর আমি সংসারের নই, আমি ভগবানের হয়ে গেছি।' গীতার গুহ্যাতিগুহ্য সার কথা এটি। নারী তো বিবাহের পরই শ্বশুরালয়ের হয়, কিন্তু জীব সর্বদাই ভগবানের, কারণ সে ভগবানেরই অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'** (গীতা ১৫।৭)। কিন্তু ভগবানকে ভুলে গিয়ে মানুষ পরের হয়ে যায় এবং দুয়ারে দুয়ারে

তিরস্কৃত হয়ে শুধু দুঃখই পায়। তাই শরণ নেওয়া মানে কেবল নিজের ভুলের সংশোধন, কোনো নতুন কাজ করা নয়।

সরল হৃদয়ে যদি সঙ্কল্প করে নেওয়া যায় যে, 'আমি ভগবানের', তাহলেই জীবনের দশা পাল্টে যাবে, জীবন শুদ্ধ, পবিত্র, মহান হয়ে যাবে। গোস্বামী তুলসীদাস বলেছেন—

বিগরী জনম অনেক কী সুধরৈ অবহীঁ আজু।

হোহি রাম কে নাম জপু তুলসী তজি কুসমাজু॥ (দোহাবলী ২২)

ভগবানের প্রতি শরণাগত হয়ে তাঁর নাম-জপ, ধ্যান, ভজন, কীর্তনাদি করতে পারলে বহু জন্মের বিকার আজই, এখনই, এই মুহূর্তেই শোধন হয়ে যাবে। একটা দিন মানে তো লম্বা ব্যাপার, রাত্রি বারোটা পর্যন্ত দিনটি থাকে। কিন্তু ভগবানের প্রতি শরণ নিলে তো এখন, এই ক্ষণেই উদ্ধার পাওয়া যাবে। এইজন্য ভগবান বলেছেন—**'মা শুচঃ'**, 'সমস্ত চিন্তাকে ছেড়ে দাও।' আমি ভগবানের শরণ নিয়ে নেওয়ার পর তো, ভগবানই জানেন তিনি কী করবেন না করবেন, আমার আর ভাবনা কিসের !

'হোহি রাম কো নাম জপু', ভগবানের আশ্রয় নিয়ে নামজপ করলে, সেই নামজপ সবচেয়ে ভালো হয়। যেমন শিশু 'মা, মা' করে কাঁদলে যিনি তার মা, তিনি তাড়াতাড়ি তার কাছে চলে আসেন। সেখানে যে সব স্ত্রীলোকের সন্তান আছে তারা সকলেই তো মা, কিন্তু এই শিশুটি কাঁদলে অন্য মায়েরা ছুটে আসেন না, তার মা-ই আসেন। কারণ ঐ শিশুটি কেবল এই স্ত্রীলোকটিকেই 'মা' বলে ডাকে, অন্যদের নয়। হয়তো এই স্ত্রীলোকটির বস্ত্র তেমন ভালো নয়, হয়তো অলঙ্কারও নেই, দেখতেও হয়তো তিনি সুন্দর নন, কিন্তু শিশুটি 'মা' বলে তাঁকেই ডাকে এবং তাঁরই ক্রোড়ে যেতে চায়। এইরকমই ভক্ত ইষ্টকে যে রূপে নামজপ করুন, তিনিই (রাম, কৃষ্ণ, শঙ্কর, দুর্গা ইত্যাদি রূপে) আসেন। মা তো বহু নারীই হতে পারেন, কিন্তু ভগবান তো বহু নন। ভগবান হলেন তত্ত্বত এক, অদ্বিতীয়।

শিশুকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার করা যেমন মায়ের দায়িত্ব, শিশুটির নিজের নয়,—তেমনই শরণাগত ভক্তকে শুদ্ধতা প্রদান করা ভগবানেরই দায়িত্ব, ভক্তের নয়। শরণ নেওয়ার পর ভক্তের আর কোনো চিন্তার প্রয়োজনই থাকে না। মীরাবাঈ সার কথাটি বুঝে নিয়েছিলেন—**'মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ।'** এই জন্যই ভক্তিমতি মীরা, নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, শোকহীনা হয়ে গেছিলেন অর্থাৎ তাঁর মনে না ছিল কোন চিন্তা, কোনো ভয়, কোনো শোক বা কোনো শঙ্কা, ছিল কেবল প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়। মীরাবাঈ ছিলেন পর্দানসীন মহিলা। পর্দার আড়ালেই তাঁর জন্ম তথা জীবন নির্বাহ। বস্তুত সর্বদা পর্দানসীন অবস্থায়ই তিনি ছিলেন। একে তো তিনি নারী তার ওপর পর্দানসীন, তবুও তিনি একাকিনী বৃন্দাবনে চলে গেছিলেন, দ্বারকায় গেছিলেন। তাঁর অন্তরে কোনো ভয়ই ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে সহায়তা করার কেউ না থাকলেও তাঁর অন্তরে ছিল প্রবল দৃঢ়তা। এইজন্যই **'মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ'**—এটি ছাড়া আর কোনো কথাকে মেনে নেওয়ার আবশ্যকতা নেই। যে কেউ ঘরেই থাক বা বাইরেই যাক্, যে কোনো অবস্থাতেই সে থাকুক না কেন, যদি ভগবানকে আশ্রয় করে সে থাকে তো তার কোনো ব্যাপারেই ভয়ের কিছু নেই।

ভগবান বলেছেন, **'মামেকং শরণং ব্রজ'** 'শুধু আমার প্রতি শরণাগত হও'। এইরকম বলার তাৎপর্য হল, শরণ নিতে হবে অনন্যভাবে অর্থাৎ 'আমি শুধু ভগবানেরই, আর কারোরই নয়।' এরপর সাধন-পথের যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সবই আপনা থেকে পূরণ হয়ে যাবে। এমন কি শরণাগতিতেও যদি কোনো ফাঁক থাকে তাও পূরণ হয়ে যাবে। নববধূর প্রথম প্রথম পিত্রালয়ের প্রতি মোহ থাকে, পরে নিজে নিজেই তা কেটে যায়। শ্বশুরালয়ে সে একসময় মা হয়, পিতামহী-প্রপিতামহীও হয়। একসময় তার মনেও থাকে না যে সে অন্য ঘরের মেয়ে। যখন তার নাতি-

পুতির বিয়ে হয়, সেই বধূকে নিয়ে সে বলে যে, পরের ঘরের মেয়ে এসে তার ঘরে ঝামেলা করছে। তখন যদি তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে 'আপনি তো এই ঘরেরই মেয়ে, তাই না ?' সে কিন্তু নিজেকে আর 'পরের ঘরের মেয়ে' বলে মানতে চায় না। সে বলে 'আমার ছেলে, আমার নাতি, আমারই পরিবার, আর আমি কি না পরের ঘরের ? তা কী করে হবে ? আমিই তো এই সংসারের প্রধানা।' আসলে সেই বৃদ্ধা এই সংসারে এমনভাবে লিপ্তা হয়ে গেছেন যে, তিনি মনে করছেন তিনি ঐ গৃহেরই। এই রকমই ভগবানের শরণাগত হয়ে যাওয়া কর্তব্য। একবার হলেই দেখা যাবে তখন পূর্ণতা ঘটছে নিজে থেকেই। মানুষটি সর্বদা নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, শোকহীন হয়ে যাবে। ঐ বৃদ্ধা প্রপিতামহী যেমন গৃহের প্রধানা হয়ে গেছেন, সেরকমই শরণাগত মানুষটি ভগবদ্-ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে যাবে। শ্রীব্রহ্মা বলেছিলেন শ্রীভগবানকে—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৮)

'যে মানুষ সর্বক্ষণ অতি ব্যাকুলভাবে আপনার কৃপাকেই অনুভব করে থাকে এবং প্রারব্ধানুযায়ী সুখ বা দুঃখ যাই পেতে হোক না কেন নির্বিকারভাবে তা ভোগ করে এবং যে প্রেমপূর্ণ হৃদয়, গদ্গদ বাক্য তথা পুলকিত দেহে নিজেকে আপনার চরণে সমর্পিত করে থাকে—এমন ভাবে জীবনযাপনকারী সেই মানুষ তো অবশ্যই আপনার পরমপদের অধিকারী হয়, —এ যেন পুত্রের দ্বারা পিতার সম্পত্তিকে পাওয়া।'

ভগবান বলেছেন, **'মৈ তো হুঁ ভগতনকা দাস, ভগত মেরে মুকুটমণি।'** শরণাগত ভক্ত নিজেকে ভগবানের প্রতি নিবেদিত করে দিলে ভগবানও নিজেকে ভক্তের কাছে দিয়ে দেন ; তিনি তো স্বয়ংই বলেছেন—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১)।

রাজা অম্বরীষ ছিলেন ভগবানের খুব ভক্ত। একবার তাঁকে বিপদে ফেলার অভিপ্রায়ে এসেছিলেন ঋষি দুর্বাসা। তখন অম্বরীষ 'দ্বাদশী-প্রধান একাদশী' ব্রত পালনে রত ছিলেন। তিনি যখন ব্রতটির সমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, এমন সময় উপস্থিত হলেন ঋষি দুর্বাসা। অম্বরীষ তখন তাঁকে ভোজন গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা করলে, ঋষি বললেন যে, তিনি আগে স্নান ও সন্ধ্যা পূজা সেরে আসবেন তারপর ভোজন করবেন। কিন্তু দুর্বাসা ইচ্ছা করেই জেনে-বুঝে ফিরতে দেরি করতে লাগলেন। এদিকে দ্বাদশীর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে অম্বরীষ পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তাঁর কী করা উচিত, দ্বাদশীর সময় তো পার হয়ে যাচ্ছে ; তিথি-কাল থাকতে থাকতেই তো ব্রত-পালনটি হওয়া চাই ; কিন্তু ঋষির ফেরার আগেই বা তিনি কী করে ভোজন করেন! তখন তাঁরা নির্দেশ দিলেন যে, নির্জলা উপবাসকারী যদি তুলসীপত্র ও চরণামৃত গ্রহণ করেন তাহলে তাতে ভোজন করাও হবে আবার তাকে যথার্থ ভোজন করাও বলা যাবে না। তাই শুনে অম্বরীষ চরণামৃত পান করলেন। যখন দুর্বাসা বুঝতে পারলেন যে তাঁর ভোজনের আগেই অম্বরীষ চরণামৃত গ্রহণ করে ব্রত সম্পন্ন করেছেন, তিনি ভয়ঙ্কর রেগে গেলেন। তিনি অম্বরীষকে মারার জন্য নিজের জটা ছিন্ন করে তা থেকে একটি ঘাতকের সৃষ্টি করলেন। অম্বরীষ কিন্তু করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্থিরভাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সুদর্শন চক্র সেখানে এসে ঐ পিশাচ ঘাতকটিকে শেষ করে দিল এবং দুর্বাসার পেছনে ধাবিত হল। দুর্বাসা তো ছুটতে ছুটতে লোকে লোকান্তরে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশঙ্করের কাছেও গেলেন, কিন্তু কেউই তাঁকে চক্র থেকে রক্ষা করতে পারলেন না, তখন দুর্বাসা গেলেন শ্রীবিষ্ণুর কাছে এবং চক্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করায় ভগবান বললেন যে, এ কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব না ; কারণ তিনি চক্রটি অম্বরীষকে রক্ষা করার জন্য দিয়ে দিয়েছেন, ফলে ঐ চক্রটি আর তাঁর নয়।

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুর্ভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৩)

'দুর্বাসা ! আমি সর্বদা ভক্তগণের অধীন, স্বতন্ত্র নই। ভক্তজন আমার বড়ই প্রিয়। আমার হৃদয়ের ওপর তাদের পূর্ণ অধিকার আছে।'

অগত্যা সঙ্গে সঙ্গে দুর্বাসা চলে গেলেন অম্বরীষের কাছে এবং তাঁর চরণে পড়ে প্রার্থনা করলেন যাতে তিনি রক্ষা পান। তখন চক্র থেকে দুর্বাসা অব্যাহতি পেলেন। এর তাৎপর্যটি হল, ভগবানের শরণাগত হলে ভক্ত ভগবানের থেকেও বড় হয়ে যায়। এইজন্যই স্বয়ং ভগবানও সুদর্শন চক্র থেকে দুর্বাসাকে রক্ষা করতে পারেননি। ভগবান সোজা বলে দিয়েছিলেন যে, এ কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। এই কারণে কেউ যদি সরল হৃদয়ে ভগবানের প্রতি, 'হে আমার প্রভু, আমি তো শুধু আপনারই'—এইভাব অবলম্বন করে, সে অবশ্যই নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃশঙ্ক ও শোকহীন হয়ে যায়।

সুগ্রীব ভগবান শ্রীরামকে বলেছিলেন যে, যাতে মাতা জানকীকে খুঁজে পাওয়া যায়, সেইরকম প্রস্তুতি তিনি নিচ্ছেন[১]। তেমনই ভগবানও বলেছেন ইহলোক-পরলোকে সব কাজ তাঁর ভরসায় ছেড়ে দিতে—

সখা সোচ ত্যাগহু বল মোরেঁ। সব বিধি ঘটব কাজ মৈঁ তোরেঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৭।৫)

এই সুগ্রীবই যখন ভগবানের কাজ করতে ভুলে গেছিল, তখন ভগবান বলেছিলেন যে, 'যে বাণে আমি বালিকে হত্যা করেছি, সেই বাণ দিয়েই সুগ্রীবকে মারবো।' তখন লক্ষ্মণ বলেছিলেন—'মহারাজ ! আপনার কষ্ট করার দরকার নেই, এই কাজ তো আমিই করে দিতে পারি।' এর উত্তরে

[১]সব প্রকার করিহউঁ সেবকাঈ। জেহি বিধি মিলিহি জানকী আঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৫।৪)

ভগবান বলেছিলেন, 'না না, সুগ্রীবকে মারবে না, ও তো আমার মিত্র। ওকে কেবল ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে নিয়ে এসো'—'**ভয় দেখাই লৈ আবহু তাত সখা সুগ্রীব॥**' (শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৮)। এমন দয়ালু ভগবান থাকতে আমাদের আর দুশ্চিন্তার কী প্রয়োজন ? তাঁর ভরসাতেই নিশ্চিন্ত থাকতে হবে। দয়ালুদাসজী বলেছেন,

বোল ন জাণূঁ কোয় অল্প বুদ্ধি মন বেগ তেঁ।
নহি জাকে হরি হোয় যা তো মৈঁ জাণূঁ সদা॥

(করুণাসাগর ৭৪)

আমি সবসময়ের জন্য জানি যে, যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। সংসারের বল তথা ভরসাই বাধার কারণ। ইহলোক পরলোক সব কিছুর জন্যই এক ভগবানের চরণে আশ্রয় নিয়ে নিলে নির্ভয় হয়ে যাওয়া যায়—

জব জানকীনাথ সহায় করে তব কৌন বিগাড় করে নর তেরো।

যখন ভগবান আমার সহায়ক, তখন আর আমার ক্ষতি করার মতো কেউ থাকতেই পারে না। ভ্রাতা হোক বা ভগ্নী হোক, ছোট বা বড় যাই হোক, সাক্ষর বা নিরক্ষর যেমনই হোক, ধনী বা নির্ধন হোক, অর্থাৎ তার পরিচয় যেমনটিই হোক না কেন, যে ভগবানের ওপর নির্ভর করে, তার সহায়তার জন্য ভগবান সদা প্রস্তুত, সর্ব দিক থেকে প্রস্তুত।

উমা রাম সম হিত জগ মাহীঁ। গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১২।১)

ভগবানের মতো হিতপ্রদানকারী আমাদের কেউ নেই। এইজন্য হৃদয় উজাড় করে ভগবানকে ডাকা উচিত। মীরাবাঈ আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন—'**মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ।**' ভগবান দেখেন না, কে কেমন লোক। বৃষ্টি যখন বর্ষিত হয়, তখন সে দেখে না জায়গাটা কেমন, ভালো না খারাপ ! গাছটি কন্টকযুক্ত, না ফলসম্পন্ন। সমুদ্রের তো জলের কোনো অভাবই নেই, কিন্তু তার ওপরও বৃষ্টির ধারা

বর্ষিত হয়। তেমনই ভগবানের কৃপাও সর্বত্র বর্ষিত হচ্ছে। সবাই-ই তাঁর কৃপার পাত্র। এই কারণেই কখনো কারোর হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

এক ভরোসো এক বল এক আস বিশ্বাস।
এক রাম ঘনস্যাম হিত চাতক তুলসীদাস॥

(দোহাবলী ২৭৭)

চাতক পাখির নির্ভরতা শুধু বর্ষার জলেই। একবার একটি চাতক যখন আকাশে উড়ছিল, একটি ব্যাধ তাকে হত্যা করে এবং চাতকটি নীচে পড়ে যায়। নীচেই গঙ্গানদী বহমানা ছিল, মরণকালেও কিন্তু চাতকটি নিজের ঠোঁটটি ঊর্ধ্বমুখী করে রেখেছিল, যাতে তার মুখে কোনোক্রমেই গঙ্গাজল না প্রবেশ করতে পারে।

বধ্যো বধিক পর্‍্যো পুন্য জল উলটি উঠাই চোঁচ।
তুলসী চাতক প্রেম পট মরতুহুঁ লগী ন খোঁচ॥

(দোহাবলী ৩০২)

চাতকটির যেমন শুধু বর্ষার জলেই নির্ভরতা ছিল, তেমনই মানুষের কেবল ভগবানের ওপরই নির্ভর করা উচিত। এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে অন্যদের খোসামোদ করে কী লাভ হয় ? এক ভগবানের আশ্রয় নিয়ে নিলেই তো আর অন্য কোনো আশ্রয়ের প্রয়োজনই থাকে না।

শিশু যখন মাতৃক্রোড়ে বসে থাকে সে নিশ্চিন্তে রাজাকেও ধম্‌কাতে পারে, অথচ তার মার কিন্তু তেমন কোনো শক্তিমত্তাই নেই। কিন্তু ভগবান তো সর্বশক্তিমান, তাঁর ভাণ্ডারে তো কোনো জিনিসেরই অভাব নেই। তিনি যে কোনো সুন্দরের থেকেও সুন্দর, বলবানের থেকেও বলবান, ধনবানের থেকেও ধনবান, বিদ্বানের থেকেও বিদ্বান। তিনি সর্বদিক দিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্জুন ভগবানকে বলেছিলেন—**'ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ'** (গীতা ১১।৪৩)। 'আপনার সমানই কেউ নেই, তাহলে আর আপনার চেয়ে বড় অন্য কেউ হবেই বা কী করে ?' এমন সর্বসমর্থ ও

অদ্বিতীয় ভগবান যখন আমার নিজের, তখন অন্য কিসের চিন্তা ? আমার একটুও চিন্তা, ভয় বা শোক করার প্রয়োজন নেই।

শরণাগতি খুবই সহজ, সুগম তথা শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভগবান বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

(বাল্মীকিরামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

"যে একবারের জন্যও আমার শরণ নিয়ে 'আমি আপনার প্রতি নিবেদিত' বলে আমার আশ্রয়ে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে, তাকে আমি সমস্ত প্রাণীকুল থেকে নির্ভয় করে দিই—এই আমার ব্রত (নিয়ম)।"

একবার যদি কেউ 'আমি আপনার প্রতি নিবেদিত' বলে তাহলে দ্বিতীয়বার আর বলার কী থাকলো ? একবার নিজেকেই নিবেদন করে দিলে আর পরের বারের জন্য দেওয়ার কী থাকতে পারে ? শরণাগত হওয়ামাত্রই সব কাজের সমাধা হয়ে গেল। যত জন্ম ধরেই কেউ পাপ করে থাক না কেন সব দূর হয়ে যাবে। এই বিষয়ে অন্য কারোর সম্মতি নেওয়ারও প্রয়োজন থাকে না। কারোর আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কাউকে তদ্বির করার প্রয়োজন হয় না, কারোর ওপর ভরসা করারও প্রয়োজন হয় না, কেবল এক ভগবানের হয়ে যেতে হয়। তাহলে আর কাউকে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা থাকেই না। ভগবানই পূর্ণ অভয় প্রদান করবেন। আমার আর নতুন করে কোনো কাজ করতে হবে না, আমি সর্বসময়ের জন্য ভগবানেরই আছি, কেবল নিজের বোঝার ভুলটি দূর করা দরকার।

— ০ —

॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে
সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 556 **গীতা-দর্পণ**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৪) 13 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**
অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ সহ সরল অনুবাদ।

(৫) 496 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(৬) 1393 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(৭) 395 **গীতা-মাধুর্য**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(৮) 957 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

(৯) 1455 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (লঘু আকারে)

কোড নং

(১০) 954 **শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)**
তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।

(১১) 275 **কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়**
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(১২) 1456 **ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়**
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(১৩) 1119 **ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?**
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(১৪) 1305 **প্রশ্নোত্তর মণিমালা**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(১৫) 1102 **অমৃত-বিন্দু**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(১৬) 1115 **তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(১৭) 1358 **কর্ম রহস্য**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(১৮) 1368 **সাধনা**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
সাধন পথের জিজ্ঞাসুদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তিকা।

(১৯) 1122 **মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

কোড নং

(২০) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(২১) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(২২) 1460 **বিবেক চূড়ামণি** (মূল সহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২৩) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলি**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(২৪) 903 **সহজ সাধনা**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধনার সহজ দিগ্‌-দর্শন।

(২৫) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(২৬) 1306 **কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

(২৭) 955 **তাত্ত্বিক-প্রবচন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

গভীর তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।

(২৮) 428 **আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন**

লেখক.—স্বামী রামসুখদাস

বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা।

জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(২৯) 296 **সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা**

(৩০) 1359 **পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি**

(৩১) 1140 **ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব**

কোড নং

স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৩২) 1303 সাধকদের প্রতি
(৩৩) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন
(৩৪) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী
(৩৫) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৩৬) 956 সাধন এবং সাধ্য
(৩৭) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য
(৩৮) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি
(৩৯) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব
(৪০) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৪১) 443 সন্তানের কর্তব্য
(৪২) 469 মূর্তিপূজা
(৪৩) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৪৪) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

অন্যান্য

(৪৫) 762 গর্ভপাত করানো কি উচিত —আপনিই ভেবেদেখুন
(৪৬) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়
(৪৭) 1043 নবদুর্গা
(৪৮) 1096 কানাই
(৪৯) 1097 গোপাল
(৫০) 1098 মোহন
(৫১) 1123 শ্রীকৃষ্ণ
(৫২) 1292 দশাবতার
(৫৩) 1439 দশমহাবিদ্যা
(৫৪) 1103 মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৫৫) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৫৬) 626 হনুমানচালীসা
(৫৭) 848 আনন্দের তরঙ্গ
(৫৮) 1356 সুন্দরকাণ্ড
(৫৯) 1322 শ্রীশ্রীচণ্ডী